ঐচ্ছিক বাংলা

By

Prof. Dev-Datta M. A.

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলীর সংজ্ঞা

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া দীর্ঘ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব ধর্মভিত্তিক যে বিপুল গীতি সাহিত্য বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারকে রঙে রসে বর্ণে গন্ধে পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাকে সাধারণভাবে বৈষ্ণব পদাবলী বলা যেতে পারে। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া এই আশ্চর্য পদাবলী সাহিত্য বাঙলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ইহার স্বর্গীয় সুরের ইন্দ্রজাল স্পর্শে তাহাদের দেহমন যে ভাবে মাতাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বাস্তবিক তুলনারহিত। অন্য কোন সাহিত্য এইরূপ জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বজন মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় নাই। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। পূর্বরাগ, উক্তি প্রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নির্হেতুমান, প্রেমবৈচিত্ত্য, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসন্তীলীলা, বিরহ, পুনর্মিলন, প্রেমের এই বহুবিভাগের পর্যায়ে পর্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস; ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ, বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাহাদের অশ্রুর ইতিহাস।"

"বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে। তাহা ভক্ত সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা নদীর মোহনার সহিত তুলিত হইতে পারে, এই গীতি কুলকুল স্বরে মানবজগতের সুখ দুঃখের কথা গাহিতে গাহিতে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছায় যেখানে সমস্ত সীমার বাঁধ চলিয়া যায়। সীমাবদ্ধ দুই পারের মধ্যে চলিয়া এমন স্থানে উপস্থিত হয়, যাহা একেবারে অসীম।"

গীত অর্থে 'পদ' শব্দটির ব্যবহার বেশ প্রাচীনকাল হইতেই করা হইতেছে। আচার্য ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্রে গীত অর্থে পদ শব্দটি ব্যবহৃত। মহাকবি কালিদাস ও তাঁহার 'মেঘদূত' কাব্যে গীতার্থে এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'পদাবলী' শব্দটি আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শে 'পদ সমুচ্চয়' বা অনেকগুলি পদ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, মহাকবি জয়দেবই সর্বপ্রথম তাঁহার গীতগোবিন্দম্ কাব্যে 'গীতসমূহ' এই অর্থে পদাবলী শব্দটি ব্যবহার করেন।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম।
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥"

রসতত্ত্ব বৈষ্ণব কবিদের আশ্চর্য প্রতিভার স্পর্শে সর্বজন আস্বাদ্য অলৌকিক কাব্যরসে পরিণত হইয়াছে। দর্শনতত্ত্বের সুকঠিন তুষার পর্বত অতিক্রম করিয়া অনন্ত রসসমুদ্রের তীরে উত্তরণ—ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর স্বরূপ নির্ণয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন "অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসীম, এবং আকাশেই যেরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়া অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানব মনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই অসীম প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভব নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিতে চায়—প্রেমের জন্য। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দর্শন করিয়া কাব্যে তাহার রসরূপ দিয়াছেন। সেই জন্য বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য উপজীব্য প্রেম। বৈষ্ণব কবিগণের প্রধান ধর্ম প্রেমধর্ম। যে প্রেম জগৎ ও জীবনের সুনির্দিষ্ট চক্রবদ্ধ বাঁধাধরা পথে অগ্রসর হয় না, যে প্রেম কোন জাগতিক বাধাবিঘ্ন মানে না, যে প্রেম একান্ত অবহেলায় স্বর্গের বিপুল সুখসম্ভোগ ঐশ্বর্য পায়ে দলিয়া চলিয়া যায়, যে প্রেমে আত্মসুখের সামান্যতম আভাষ নাই, যে প্রেম প্রতিদানের আশা না করিয়া অবিরত শুধু দান করিয়া চলে, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম সেই প্রেম। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই প্রেমই নিজেকে শত সহস্র রূপে অবিরত প্রকাশ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর এই ভাবময় প্রেমরস আস্বাদনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।"

বৈষ্ণব সাধকগণ ভগবানকে ঐশ্বর্যশালী সর্বশক্তিমান ভাবিয়া তাঁহাকে শুধু পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে প্রেমের মধ্য দিয়া হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই ভক্তের সহিত অভিন্ন। বৈষ্ণবভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের মধ্য দিয়া নানা লীলায় নিরত। বিভিন্ন লীলারসের মধ্যে কান্তা প্রেমাশ্রয়ী মধুর রসের সাধন-ভজনই বৈষ্ণবধর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এখানে ভগবান কান্ত, এবং ভক্ত কান্তা। পতি-পত্নীর সুনিবিড় প্রেমের আলোকে ভগবান ভক্তের সম্পর্কের মূল্যায়ন বৈষ্ণবভক্তগণের এক

ধর্ম এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তরিত হয়। গুপ্তযুগে গুপ্ত সম্রাটগণ নিজেদের 'পরম ভাগবত' নামে অভিহিত করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে তাহাদের 'পরম বৈষ্ণব' উপাধির অধিকারী দেখা যায়।

ভাগবত ধর্মের মূল উৎস অস্পষ্ট। এই ধর্মের অন্য নাম স্বাত্বত বা একান্তিক ধর্ম। দৈবকীপুত্র এবং ঋষি ঘোর আঙ্গিরস শিষ্য কৃষ্ণ বাসুদেব যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই—ভাগবত ধর্ম। এই ধর্মের মূল প্রেরণা যে সূর্যোপাসনা, মহাভারতের শান্তিপর্বে তাহার উল্লেখ আছে:

"স্বাত্বতম্ বিধিমাস্থায়
প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্॥"

সর্বপ্রথম মথুরাতে এই ধর্ম খৃষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে প্রচারিত হয়। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' রচিত হয়। ইহার মধ্যে 'বাসুদেবক' ও ভাগবত ধর্মের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে গুপ্ত যুগে ভাগবত ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। তবে দক্ষিণ ভারতে এই ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বেশী। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে তৃতীয় শতক পর্যন্ত ভাগবত ধর্মের ইতিহাস অস্পষ্ট। গুপ্ত রাজত্ব হইতেই ভাগবত ধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ভাগবত ধর্ম প্রচারে গুপ্ত রাজাদের বিরাট ভূমিকা ছিল। গুপ্তযুগে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মধ্যে অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়া বিষ্ণুকে ভগবান এবং কৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা ও পূজা পদ্ধতি এই সময়ে প্রচলিত হয়। পঞ্চম শতকে গুপ্তরাজত্বের পতন হয়। এই সময়ে ভাগবত ধর্ম বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। নবম শতকের প্রারম্ভে ভাগবত ধর্ম বেশ শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা শুধু পশ্চিম ও মধ্য ভারতে নহে, দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের আলবার সম্প্রদায়ের আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভাগবত ধর্ম এখানে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। কালক্রমে ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। যথা—ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্র, বৈ-খানস ও কর্মহীন। ইহাদের সকলের উপাস্য দেবতা বাসুদেব, নারায়ণ ও বিষ্ণু। কৃষ্ণ ইহাদের কাহারও উপাস্য নহে। পরবর্তীকালে ভাগবত ধর্ম প্রধান চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যথা, শ্রী, সাধ্বী, রুদ্র ও সনক। পদ্মপুরাণে ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকো বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥"

কৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ। বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার উল্লেখ আছে। সুপ্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, কৃষ্ণ ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। তিনি দেবকী পুত্র। এখানে কৃষ্ণ মানব মাত্র। জৈন উত্তরাধ্যায়ন সূত্র ও ঘত জাতকে কৃষ্ণকে মানবরূপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গীতায় তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়াই বৃষ্ণি রাজপুত্র বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ আঙ্গিরসের নিকট হইতে যে সাত্বতবিধি-শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাই তিনি গীতায় অর্জুনকে শিক্ষা দিয়া যেন।

রাধার অস্পষ্ট রূপাভাস পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার সর্বপ্রথম স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়—

"এতস্মিন্নন্তরে তত্র সকামঃ সুরতোন্মুখঃ
চুম্বাপ রাধয়া সার্দ্ধং রতিকরে মনোহরে॥
শৃঙ্গারাষ্টপ্রকারাঞ্চ বিপরীতাদিকং বিভুঃ।
নখদন্তকরনাঞ্চ প্রহারাঞ্চ যথোচিতং॥"

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দশম শতকেরও পরবর্তীকালে রচিত। সুতরাং কৃষ্ণের তুলনায় রাধার আবির্ভাব অত্যন্ত অর্বাচীন। হয়ত বাঙলায় বৈষ্ণবধর্মের উপর শক্তি ধর্মের প্রভাব পড়িবার ফলে কৃষ্ণের শক্তি স্বরূপিণী রাধার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে রাধা কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নহে। সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব রস সাহিত্যে রাধার সর্বপ্রথম আবির্ভাব ও উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মে তাঁহার প্রতিষ্ঠা।

বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যে জয়দেব ও গীতগোবিন্দের স্থান

বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় মহাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ কাব্যে। এই কাব্যটি তৎকালীন সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃত রচিত হইলেও পরবর্তীকালের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ও বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতের উপর ইহার প্রভাব অসামান্য। কবির জন্মস্থান বর্দমান বীরভূম সীমান্তস্থিত অজয় নদী তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী গ্রাম। পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী ও পত্নী পদ্মাবতী। জয়দেব ও পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করিয়া অনেক গল্পকাহিনী প্রচলিত।

গীতগোবিন্দের পরিচয় শুধু যে অপূর্ব কাব্যহিসাবে, তাহা নহে বৈষ্ণব-গণের নিকট ইহা শাস্ত্রগ্রন্থ রূপেও পূজিত। অনেক বৈষ্ণব ইহাকে বৈষ্ণব ভক্তি রসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিরাট একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। চৈতন্যদেবের তিনশত বৎসর পূর্বে যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাঁহার উপর চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তি রসশাস্ত্রের প্রভাব কিরূপে থাকিতে পারে? গীতগোবিন্দ রচনার পশ্চাতে যে বিশেষ কোন ধর্মদর্শন বা ধর্মবিশ্বাস ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। জয়দেব যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী। তাঁহার শিল্পী হৃদয় কোন নূতন সৃষ্টির যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উপাদানের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল এবং পরিশেষে রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলাকেই তৎকালে প্রচলিত কাব্যিক উপাদান সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া ইহার মধ্যে আপন হৃদয়বেদনা মুক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ইহাকে কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়া লইয়াছিলেন।

ভারতীয় জীবন-যুগসন্ধিক্ষণে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত তখন বহুব্যবহৃত সর্বভারতীয় ভাষা। ইতিপূর্বে এই ভাষায় অসংখ্য কাব্য নাটক শাস্ত্রাদি রচিত হইয়াছে। তাই নবাগত প্রতিভাবান শিল্প সাধকগণ এই বহু ব্যবহৃত ভাষায় কাব্যসৃষ্টির উৎসাহ না পাইয়া নবসৃষ্ট বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে আশ্রয় করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া তখন এই

লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার কিছুকাল পর তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার ফলে তাঁহার জীবন সাধনায় দেখা দিল গুরুতর পরিবর্তন—সুগভীর ঈশ্বর চিন্তা তাঁহার সকল হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। "তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির গর্ব, সমস্ত বিসর্জন দিয়া ধ্যান-তন্ময় দিব্যভাব বিভোর হইয়া পড়িলেন ও ঐশীলীলার স্ফুরণ তাহার বাস্তব চেতনাকেও অভিভূত করিল। তিনি সব সময় ও সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ-লীলার বিচিত্র বিকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন ও সমগ্র জগৎ তাঁহার নিকট এই লীলা-রসে অভিষিক্তরূপে প্রতিভাত হইল। শেষ পর্যন্ত তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণের সঙ্কল্পে স্থির হইলেন ও মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সমস্ত জগতের পাপতাপ দূর করিয়া ভগবৎ-প্রেম-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জন দিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নূতন নাম গ্রহণ করিলেন এবং এই নামেই তিনি বৈষ্ণব জগতে পরিচিত।"

ইহার পর শুধু নিরবচ্ছিন্ন কর্মসাধনার ইতিহাস। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আচণ্ডালে প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। নিজ জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার যে দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি আপন আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৫৩৩ খৃঃ তাঁহার লোকান্তর ঘটে। তাঁহার তিরোভাব সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। এ সম্পর্কে সঠিক করিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নাই।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলা দেশের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দেশের মধ্যে ছিল মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির অপ্রতিহত প্রভাব। অত্যাচার অবিচার উৎপীড়নের সীমা ছিল না। কখন যে দুর্দম রাজরোষ কিরূপে কাহার উপর আসিয়া পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অত্যাচারী রাষ্ট্র-শক্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥"

রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারে এবং উচ্চবর্ণের গোঁড়ামিতে দেশের লোকের মনে সংশয় এবং অবিশ্বাস দেখা দিয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর লোক নানাবিধ সুবিধার জন্যে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কোন সুচিন্তিত দার্শনিক মতবাদের উপর জনগণের ধর্মবোধ জাগ্রত ছিল না। হিন্দুধর্মের নামে যাহা চলিতেছিল, তাহা অন্ধ কতকগুলি আচার আচরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

"ধর্ম কর্ম করে সভে এই মাত্র জানে
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজনে।"

মোটের উপর ধর্মের মধ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমের চিহ্নমাত্র ছিল না। বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এই দারুণ বিকৃত ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্য হইতে জন্ম লইলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য। মাত্র সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার আশ্চর্য কর্ম-প্রতিভায় দেশের সর্বত্র যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়া দিলেন, তাঁহার কোন তুলনা নাই। উদার মানবিকতার উপর ধর্মের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল। সমস্তপ্রকার কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধ আচার আচরণ ইত্যাদি পরিহার করিয়া মানবপ্রেমকে ধর্মের একমাত্র মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করা হইল। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষে মানুষে যে দুরন্ত ব্যবধান ছিল, চৈতন্য-প্রচারিত প্রেম-ধর্মের বন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল। সমাজের উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে সাম্যের ভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। বাস্তবিক বাঙলাদেশের মত বিচিত্র জাতিধর্ম অধ্যুষিত স্থানে চৈতন্যদেব যে ভাবে সামাজিক সংস্কারে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। বৈষ্ণব দর্শনকে তিনি ঢালিয়া নূতন সাজিয়া এমন করিয়া গড়িয়া দিয়াছিলেন যাহার উদার ছত্রতলে লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধ-বণিতা বিনা দ্বিধায় আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিত বাঙলার ধর্ম-সমাজ-দর্শন-চিন্তাধারা যে বিপুল প্রাণবন্যার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় তুলনা নাই।

চৈতন্যের আবির্ভাবের অন্যতম অবদান

বাঙলা ভাষার আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠালাভ। প্রাকৃতের আবরণ হইতে বাঙলাভাষা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার বিকাশের পথে নানা অন্তরায় দেখা দিয়াছিল। প্রতিভাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহাদের কাব্য এবং শাস্ত্রালোচনার জন্য প্রধানতঃ সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। বাঙলা ছিল তাহাদের নিকট বহুনিন্দিত ভাষা। এই কারণেই প্রাক চৈতন্য যুগে বাঙলাভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা অতি নগণ্য। চৈতন্যদেব সর্বপ্রথম মাতৃভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার প্রেমধর্ম এই ভাষাতেই প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দও এই বাঙলাভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের ধর্ম-দর্শন-সম্পর্কীয় মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যা নহে, অনেকে তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টি কার্যেও বাঙলাভাষাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। মাতৃভাষাকে ভাবপ্রকাশের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিবার ফলে চৈতন্য সাহিত্যের মধ্যে যে স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং চৈতন্যদেব এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দই যে বাঙলাভাষার মুক্তি আনিয়া তাহার বলিষ্ঠ ক্রমবিকাশের পথটি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই বাঙলাভাষাকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব সাধক কবিগণের অন্তর্দ্বয়ের ভাবরাশি যে কাব্যধারা সৃষ্টি করিয়া বাঙলা সাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়া তুলিল, তাহা পদাবলী সাহিত্য। বস্তুত পদাবলী সাহিত্য চৈতন্য আবির্ভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগ

ইহারাই সখী নামে পরিচিত। ইহাদের একমাত্র কাম্য: রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদন। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য ইহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখপায়॥"

রাধাতত্ত্ব

কৃষ্ণের মতো রাধা ঐতিহাসিক চরিত্র নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতো অর্বাচীন পুরাণেই তাহার প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাগবতে "অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বর:" শ্লোকে রাধা নাম থাকিলেও তাহার দ্বারা কৃষ্ণশক্তি রাধার কথা বোঝায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে রাসের বিবরণে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, সাহিত্য সৃষ্টির খাতিরে সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব রস সাহিত্যে রাধার আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তাহাকে বৈষ্ণব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মের উপর শাক্ত ধর্মের প্রভাব পড়িবার ফলে কৃষ্ণের শক্তিস্বরূপিণী রাধার কল্পনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, কৃষ্ণের তুলনায় রাধার আবির্ভাব যে অত্যন্ত অর্বাচীন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে তাহাকে যে নূতন করিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাক চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে যে রাধা ছিলেন, চৈতন্যদেব আপনার ভক্তি দর্শনের আলোকে তাহাকেই নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নানা আশ্চর্য লীলাশক্তির অধিকারী। তাঁহার শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) স্বরূপ শক্তি (২) তটস্থা বা জীবশক্তি (৩) মায়া শক্তি। স্বরূপ শক্তি হইতেছে সেই শক্তি যাহার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন অস্তিত্ব বজায় রাখেন। অনন্ত কোটি জীবও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। ইহারা ভগবানের শক্তি হইতে সৃষ্ট। সুতরাং ইহারাও শক্তি। যে শক্তি দ্বারা ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মায়াশক্তি। তিনি মায়াশক্তির অধীন নহেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় (১) সৎ (২) চিৎ (৩) আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ। সৎ-এর শক্তির নাম সন্ধিনী—ইহার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছেন। চিৎ-এর শক্তি সম্বিৎ—ইহার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যময় সত্তাটি প্রকাশিত হইতেছে। আনন্দের শক্তির নাম হ্লাদিনী—ইহার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার জন্য বহুধাবিভক্ত হন। হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যে ভগবান প্রকৃতির সহিত বিচিত্র লীলায় মত্ত হন। সুতরাং এই আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত শক্তি। সৎ চিৎ ও আনন্দের মূর্ত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। তিনিই নরাকারে স্বয়ং ভগবান।

কিন্তু ইহার চেয়েও সাধ্যবস্তু কি? রামানন্দ একে একে দাস্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম, কান্তাপ্রেমের উল্লেখ করিলেন। 'কান্তাপ্রেম' মহাপ্রভুর নিকট 'সাধ্যাবধি'। অর্থাৎ সাধ্যের সীমা।

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥"

তখন—

"রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব-শাস্ত্রেতে বাখানি॥"

রামানন্দের নিকট চৈতন্যদেবের এই জিজ্ঞাসা অতিশয় বিস্ময়কর। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত ভাবিয়া তাঁহার সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে। এই সেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় 'সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥"

এবং রাধার কৃষ্ণপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সার। কৃষ্ণ আপন সৃষ্টি মাধুর্য আস্বাদনের জন্য রাধার সহিত নিত্যলীলায় রত। রাধা একান্তভাবে কৃষ্ণপ্রেমময়। রায় রামানন্দ বারবার রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন—

"রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥"

সুতরাং এই 'রাধাপ্রেম' শুধু সর্বসাধারণ নহে, ইহা সাধ্য শিরোমণি। ইহাই চরম পুরুষার্থ। ইহা জীবের মধ্যে সুপ্তভাবে রহিয়াছে। কেবলমাত্র কঠোর সাধনা দ্বারা ইহার জাগরণ সম্ভব। অতএব জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনা সাপেক্ষ। এই ভাবেই সাধ্য সাধন নির্ণয় শেষ হইল—

"প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে
সেই সব বস্তুতত্ত্ব হইল মোর জ্ঞানে॥
এবে সে জানিল সাধ্য-সাধন নির্ণয়।"

রাগাত্মিকা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি

গোপীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে দেহমন সমর্পণ করিয়াছে। তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম সাধনা দ্বারা অর্জিত নহে। ইহা জন্মগত। তাহাদের আত্মার মধ্যে এই অতুল কৃষ্ণপ্রেমের অস্তিত্ব। গোপীদের এই কৃষ্ণভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তি নামে পরিচিত। ভাগবতে ইহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ
পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ
সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

সেবার সঙ্গে সমপ্রাণতা যুক্ত হইয়াছে। উদ্ধব দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি সখ্যরসের পদ রচনা করিয়াছেন। যেমন—

"কানাই হারিল আজু বিনোদ খেলায়
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আটিয়া বান্ধে—
বংশীবটতলে লৈয়া যায়॥" [বলরাম দাস]

(৪) বাৎসল্য রস—

বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে আর এক ভাবে ভজনা করেন—এ ভাব সন্তান ভাব। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সন্তান এবং ভক্তের ভূমিকা মাতা বা পিতার। স্নেহ, ভালবাসা, শাসন প্রভৃতি যতগুলি বৃত্তি সন্তানের প্রতি প্রদর্শন করা হয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তগণ সে সবগুলি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আরোপিত হয়। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ এবং প্রয়োজন বোধে শাসনও করেন। এ ক্ষেত্রে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে মধুর স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্থায়ী ভাব এখানে 'বৎসলতা'। যশোদা বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

"বিপিনে গমন দেখি হয়ে সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা মন্ত্র পড়েন আপনি॥"

(৫) মধুর বা উজ্জ্বল রস—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে মধুর ভাবের সাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ। চৈতন্যচরিতামৃতে এই সাধনাকে সর্বসাধ্যসার বলা হইয়াছে—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেই প্রেমের হইতে—
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের পতিপত্নীর সম্পর্ক। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমপুরুষ ও ভক্তগণ তাহার লীলাসহচরী পত্নী। উভয়ের প্রগাঢ় প্রেমলীলার মাধ্যমে যে ভগবৎসাধনা হয়, তাহাই মধুর ভাবের সাধনা। সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই মধুর রসের জয়গান। এখানে স্থায়ী ভাব মধুরা নামে রতি। দাস্যে যে ভালবাসার শুরু, মধুরে তাহার পরিণতি। যেমন—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি,
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥"

মধুর রসের বৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

পরকীয়া তত্ত্ব

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে পরকীয়ার একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। রাধা পরকীয়া যেহেতু তিনি কৃষ্ণমাতুল আয়ানের পত্নী। কৃষ্ণ বাহ্যত তাঁহার নিকট পরপুরুষ। অন্যের পত্নী হইয়া রাধা আশ্চর্য ব্যাকুলতা ও আর্তি লইয়া কৃষ্ণের

দিবানিশি অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। গৌরাঙ্গ অবিরত যে প্রেমরত্ন বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে পৃথিবীর মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে। কবি গোবিন্দ দাস তাঁহার চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীন মানুষের ন্যায় দূরে পড়িয়া আছেন।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

নীরদ—মেঘ। নীর—জল। ঘন—নিবিড়। সিঞ্চনে—বর্ষণ করিবার ফলে। পুলক—আনন্দ। অবলম্ব—অবলম্বন তরু। স্বেদ—ঘর্ম। মকরন্দ—মধু। চুয়ত—চোয়াইয়া পড়িতেছে। ভাব-কদম্ব—ভাবরূপ কদমফুল। পেখনুঁ—দেখিলাম। নটবর—নৃত্যশীল। গৌর—চৈতন্যদেবের অঙ্গবর্ণ গৌর ছিল বলিয়া তাঁহাকে গৌর বলা হয়। অভিনব—আশ্চর্য। হেম—সোনা। কল্পতরু—কল্পবৃক্ষ। প্রবাদ আছে, এই বৃক্ষের কাছে যাহা প্রার্থনা করা হয়, তাহাই পাওয়া যায়। সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতেছে। সুরধুনী—গঙ্গা। উজোর—উজ্জ্বল। অভিনব হেম···সঞ্চরু—চৈতন্যদেবের গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল। ভক্তগণের মনোবাসনা তিনি সর্বদা পূরণ করেন। তাই তিনি কল্পতরুর মতো উদার। তিনি গঙ্গাতীরে যখন চলিয়া বেড়ান মনে হয় যেন একটি সোনার কল্পতরু চলিয়া বেড়াইতেছে। চরণকমল—চৈতন্যদেবের চরণকে পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ঝঙ্করু—গুণগুণ করিতেছে। ভকত-ভ্রমরগণ—ভক্তগণকে ভ্রমরবৃন্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ভোর—বিভোর, মগ্ন। পরিমলে—সুগন্ধে। লুব্ধ—লোভী। সুরাসুর—দেবতা ও দানব। ধাবই—ধাবিত হইতেছে। অহর্নিশি—দিনরাত। রহত—থাকে। অগোর—অজ্ঞান, অচেতন। অবিরত—অবিরাম। প্রেম রতন ফল—চৈতন্যদেব সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমের বাণী যেন রত্নফল স্বরূপ। অখিল—পৃথিবী। মনোরথ—মনোবাসনা। পূর—পূর্ণ হইতেছে। তারে—তাঁহার। রহু দূর—দূরে পড়িয়া আছে।

ব্যাখ্যা

চঞ্চল চরণ কমল-তলে ঝংকরু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর॥

আলোচ্য অংশটি বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের অন্তর্গত। চৈতন্যদেবের অনুপম সৌন্দর্য ও অসামান্য আকর্ষণী শক্তির পরিচয় এই অংশে পরিস্ফুট।

চৈতন্যদেব প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি আত্মহারা। তাঁহার মেঘবৎ চক্ষু হইতে অবিরাম অশ্রু বর্ষণ হইতেছে। ইহার ফলে তাঁহার সকল অঙ্গে জাগিতেছে পুলক, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবরাজি। কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইয়া তিনি নৃত্য করিতেছেন। চৈতন্যদেব কল্পবৃক্ষের ন্যায় উদার। কল্পবৃক্ষ

শব্দার্থ ও টিকাটিপ্পনী

সই—সখি। শ্যাম নাম—কৃষ্ণ নাম। মরমে—হৃদয়ে। পশিল—প্রবেশ করিল। জপিতে—জপ করিতে। পরতাপে—প্রতাপে, প্রভাবে। ঐছন কয়ল গো—এমন করিল। পরশে—স্পর্শে। যুবতী ধরম—যুবতী নারীর ধর্ম। পাসরিতে—ভুলিতে। পাসরা না যায় গো—কিছুতেই ভোলা যায় না। যৌবন যাচায়—রূপ যৌবন যাচিয়া দান করে।

ব্যাখ্যা

নাম পরতাপে যার ঐছন কয়ল গো।
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ' বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে শ্যাম নামের প্রভাবের তীব্রতা বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাধার জীবন শ্যামময়। শ্যামের নাম শুনিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। শ্যাম নাম তাঁহার কানের ভিতর দিয়া একেবারে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। শ্যাম নামের মাধুর্য তাঁহার দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি শ্যাম নাম শুনিয়াছেন, এখন সেই নাম অবিরাম মনের মধ্যে ইষ্ট মন্ত্রের মতো জপ করিতেছেন। শ্যাম নামটি যেন মধুময়। তাই এই নামের আস্বাদনে কোন ক্লান্তি নাই। বারবার এই নাম তিনি মুখে উচ্চারণ করিতেছেন। এই নাম জপ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় যেন ধীরে ধীরে অবশ হইয়া যাইতেছে। পাইবার জন্য গভীর আকুলতা। কৃষ্ণকে কিরূপে পাওয়া যায়, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন। সেই সঙ্গে তাঁহার মনে জাগিতেছে আর একটি চিন্তা। তিনি ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই তো তাহার দেহমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, তিনি যেন আর নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় কৃষ্ণের অঙ্গের স্পর্শে তাহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা তো তিনি চিন্তাও করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণকে চোখে দেখিয়া যুবতী ধর্ম অর্থাৎ সতীত্ব কিরূপে তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহা তিনি জানেন না।

পূর্বরাগ

চণ্ডীদাস

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকিয়া একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

রাধা কৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালোবাসিয়াও তিনি যে প্রকৃত কে, তাহা জানিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি বলেন যে রাধা কৃষ্ণ দুইজনেই দুইজনের মতো, অর্থাৎ উভয়ের প্রেম অনন্ত।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

হাথক—হাতের। দরপণ—দর্পণ, আয়না। মাথক—মাথার। নয়নক—নয়নের। অঞ্জন—কাজল। মুখক—মুখের। তাম্বুল—পান। হৃদয়ক—হৃদয়ের। মৃগমদ গীমক—গলার। দেহক—দেহের। সরবস—সর্বস্ব। গেহক—গৃহের। পাখীক—পাখীর। পাখ—পাখা। মীনক—মাছের। পানি—জল। জীবক—জীবের। হাম—আমি। ঐছে—এমন। তুহুঁ—তুমি। কৈছে—কেমন। মাধব—কৃষ্ণ। মোর—আমাকে। দুহুঁ—দুইজনে। হোয়—হয়।

ব্যাখ্যা

পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত পূর্বরাগ ও অনুরাগ শীর্ষক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাধার জীবনে কৃষ্ণের সর্বময়তা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে।

রাধার জীবন কৃষ্ণময়। তাঁহার কাছে প্রিয়বস্তু যাহা কিছু আছে, কৃষ্ণ যেন তাহারই প্রতীক। কৃষ্ণ তাহার হাতের দর্পণ-স্বরূপ। কৃষ্ণের মধ্যে তিনি যেন নিজেকেই দেখিতে পান। মাথার ফুল তাঁহার চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কৃষ্ণ যেন তাহার মাথার ফুল। অঞ্জন তাঁহার চোখের সৌন্দর্য বাড়ায়। কৃষ্ণ তাঁহার চক্ষের অঞ্জন। তিনি তাঁহার কাছে মুখের তাম্বুলের মতো প্রিয়। তিনি তাঁহার হৃদয়ের মৃগমদ চিত্রপাতি, এবং গলার হার। কৃষ্ণকে তিনি তাঁহার দেহের সর্বস্ব মনে করেন। তিনি গৃহের সারস্বরূপ। পাখীর কাছে পাখা যেরূপ প্রিয়, মাছের কাছে জল, জীবের কাছে জীবন, রাধার কাছে কৃষ্ণও অনুরূপভাবে প্রিয়। কৃষ্ণের বাহিরে রাধার কিছুই নাই। কৃষ্ণ তাঁহার বিভিন্ন প্রিয়বস্তুর প্রতীক।

পূর্বরাগ

জ্ঞানদাস

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা সখিকে বলিতেছেন, যে সে কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে মনের ভাব জানিতে চাহিতেছে। কিন্তু তিনি কিরূপে সেই কৃষ্ণপ্রেমের বর্ণনা দিবেন। সেই প্রেম কখনো এক অবস্থায় থাকে না। তাহা প্রতি মুহূর্তেই নব নব রূপ লাভ করিতেছে। জন্মকাল হইতে রাধা কৃষ্ণের অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তথাপি তাহার নয়ন তৃপ্ত হইল না। কৃষ্ণের মধুর বাণী তিনি কতবার কানে শুনিয়াছেন কিন্তু তথাপি বারবার সেই বাণী শুনিতে ইচ্ছা হয়। কত রাত্রি কৃষ্ণের সহিত মিলনে ক্রীড়া-কৌতুকে কাটিয়া গেল। তথাপি মিলনের স্বরূপ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া কৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল না। কত বিদগ্ধ রসজ্ঞ মানুষ তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু কাহারও মধ্যে প্রকৃত প্রেমের অনুভূতি তিনি দেখিতে পান নাই। কবিবল্লভ বলেন যে প্রাণ শান্ত করিবার জন্য লক্ষের মধ্যে একজনকেও পাওয়া যায় না।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ। অনুভব—অনুভূতি। মোয়—আমার। সোই—সেই। অনুরাগ—ভালবাসা। বাখানিতে—জানাইতে, ব্যাখ্যা করিতে। তিলে তিলে—প্রতি মুহূর্তে। নূতন হোয়—নবরূপ লাভ করে। সোই পিরিতি··· হোয়—কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ বা অনুভূতি কখনো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ইহা কখনো একরূপে থাকে না, প্রতি মুহূর্তেই নূতন নূতন রূপ লাভ করে। হাম—আমি। নেহার লুঁ—দেখিলাম। তিরপিত—তৃপ্ত। ভেল—হইল। নয়ন···ভেল—জন্মাইবার পর হইতে রাধাকৃষ্ণের অনুপম রূপ-মাধুরী দর্শন করিতেছেন। এতদিনে তাহার চোখের তৃপ্তি হইবার কথা, কিন্তু এত দেখিবার পরও তাঁহার চক্ষু তৃপ্ত হয় নাই। বোল—বাণী। শ্রবণহি—কানের মধ্যে। শুনলুঁ—শুনিলাম। শ্রুতি পথে পরশ না গেল—কানের মধ্যে যাইয়া যেন স্পর্শ করিল না অর্থাৎ বার বার শুনিবার পরও পুনরায় শুনিবার ইচ্ছা দূর হইল না। মধুযামিনী—মধুময় রাত্রি। রভসে—মিলনের আনন্দে। গোঁয়াইলুঁ—কাটাইলাম। বুঝলুঁ—বুঝিলাম। কৈছন—কেমন। কেল—মিলন। লাখ লাখ যুগ—লক্ষ লক্ষ যুগ। হিয়া হিয়ে রাখলুঁ—হৃদয় রাখিলাম হৃদয়ের উপর। জুড়ন না গেল—জুড়াইল না। বিদগধ—বিদগ্ধ। রসে অনুগমন—রসে নিমগ্ন হইয়া। অনুভব কাহু না পেখ—কাহারও মধ্যে সেই গভীর প্রেমানুভূতি দেখিলাম না।

ব্যাখ্যা

কত মধু যামিনী রভসে গোয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥

আলোচ্য অংশটি কবিবল্লভ রচিত পূর্বরাগ ও অনুরাগ বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্গে রাধার অবস্থানীতে কৃষ্ণপ্রেমের অনন্ত রহস্যময়তা সম্পর্কে বলা হইয়াছে।

রাধার জীবন কৃষ্ণময়। তাঁহার দেহমনে কৃষ্ণের অবস্থান। তথাপি কৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ বোঝাইবার মতো শক্তি তাঁহার নাই। ইহা প্রতিটি মুহূর্তে নবনব রূপ লাভ করিতেছে। তিনি জন্ম হইতে কৃষ্ণের আশ্চর্য রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নয়ন তৃপ্ত হয় নাই। কৃষ্ণকে দেখিবার আকাঙ্খা তাঁহার নিবৃত্তি হয় নাই। কৃষ্ণের মধুর বাণী বহুবার শুনিবার পরও ইহা শুনিবার আকাঙ্খা যায় নাই। কৃষ্ণের সহিত মিলনের আনন্দে মধুময় রজনী অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি সেই মিলনের স্বরূপ তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি লক্ষ লক্ষ যুগ কৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয়কে মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় শান্ত হয় নাই। কৃষ্ণকে ভালবাসিবার অনুভূতি অবর্ণনীয়।

অভিসার

গোবিন্দদাস

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পণ ফনিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে॥
গুরুজন-বচনে বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমান॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণের কাছে অভিসারে যাইতেছেন। সেই অভিসারের প্রস্তুতিস্বরূপ তিনি মাটির উপর কাঁচা পুঁতিয়া তাহার পদ্মফুলের মতো সুন্দর চরণ ফেলিয়া হাঁটিতেছেন। তাঁহার চরণে যে নূপুর বাঁধা আছে, তাহাতে শব্দ হইতে পারে, এই আকাঙ্খায় তিনি বস্ত্রদ্বারা তাহা আবৃত করিয়া লইয়াছেন।

ইহার মাথায় কে চূড়া বাঁধিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের দেহের বর্ণ ইন্দ্রনীল। ইনি তো নন্দপুত্র কৃষ্ণ নহেন। ইহার রূপ নবীন। ইনি কৃষ্ণের নটবর বেশ কোথায় পাইলেন। ইহার গলায় বনমালা বেশ ভাল শোভা পাইতেছে। এতদিন ইনি কোথায় ছিলেন। এই রূপরাশি কে নির্মাণ করিল। ইহার বামে কৃষ্ণবর্ণা এক সুন্দরী। বোধহয় ইহারই প্রেমিকা ইনি। এইভাবে সখীরা কথা বলিতে লাগিল। কুঞ্জে কৃষ্ণ এবং রাধা ছিলেন। তাহারা কোথায় গেলেন কিছুই জানা যায় না। আজ যেন সবই বিপরীত। বোধহয় ইহাদের বিপরীত বেশ হইবে। চণ্ডীদাস মনে মনে হাসিয়া বলেন যে এইরূপ কোন্ দেশে দেখা যাইবে।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

আজু—আজ। মুরলী—বংশী। শ্যামরায়—কৃষ্ণ। গৌর বরণে—গৌর রঙে। আল—আলো। চূড়াটি—কৃষ্ণের মাথায় মোহনচূড়া। কান্তি—বর্ণ। তনু—দেহ। নন্দ-সুত—কৃষ্ণ, রাজা নন্দের পালিত পুত্র। নবীন—নূতন। নটবর—নর্তক। কথি—কোথায়। বনাইল—তৈরী করিল। চিকণ বরণী—কৃষ্ণবর্ণা। সুন্দরী—প্রেমিকা। ঠারাঠারি—কানাকানি। কুঞ্জে—উদ্যানে। কমলিনী—রাধা। আজু—আজ। দোঁহার চরিত—দুইজনে বেশ পরিবর্তন করিবেন।

ব্যাখ্যা

কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাস রচিত বংশীশিক্ষা ও নৃত্য বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাধাকে কৃষ্ণবেশে দেখিয়া সখিদের সাময়িক প্রতিক্রিয়া এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

রাধা কৃষ্ণের নিকট বংশী শিক্ষা করিতে চাহিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার নিজস্ব বেশে সাজাইয়াছেন। রাধা পরিয়াছেন কৃষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া। কৃষ্ণ পরিয়াছেন রাধার নীলশাড়ি। সখিরা ফুল তুলিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া অবাক। আজ যে বংশী বাজাইতেছেন, তিনি তো কৃষ্ণ নহেন। কৃষ্ণের গায়ের রঙ কালো। কিন্তু ইহার গৌরবর্ণে বন আলোকিত। রূপে ইনি নবীন। ইহার গলে বনমালা বেশ সুন্দর দেখাইতেছে। ইহার বামে কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরী সম্ভবতঃ ইহার প্রেমিকা হইবেন। তাহারা তো কুঞ্জে কৃষ্ণ এবং রাধাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখন ইহারা কাহারা আসিলেন? ইহাদের পরিচয় কি। আজ সব কেন বিপরীত হইয়া গেল। বোধহয় দুইজনে বেশ পরিবর্তন করিবেন।

নিবেদন
চণ্ডীদাস

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু-মন।
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সব
তোহারি চরণখানি ॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণের কাছে এই নিবেদন করিয়াছেন যে তিনি তাঁহার প্রাণ। তিনি তাঁহাকে দেহ-মন-কুল-শীল প্রভৃতি সব কিছুই সমর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ অখিলের রাজা, যোগীর আরাধ্য ধন। রাধা গোপ গোয়ালিনী অতি দীনহীন—কৃষ্ণের ভজন-পূজন জানেন না। প্রেমের রসে দেহমন সিক্ত করিয়া তিনি কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহার পতি, তিনি তাঁহার পরম গতি। তাঁহার মনে আর কোন কিছু নাই। তাঁহাকে সব লোক কলঙ্কিনী বলিয়া ডাকে। ইহাতে তাঁহার মনে কোন দুঃখ নাই। কৃষ্ণের জন্য গলায় কলঙ্কের হার পড়িতে তাঁহার মনে অনেক সুখ। তিনি সতী বা অসতী, তাহা কৃষ্ণই জানেন। তিনি ভাল মন্দ কিছুই জানেন না। চণ্ডীদাস বলেন যে পাপ হোক বা পুণ্য হোক, কৃষ্ণের চরণ তাঁহার সর্বস্ব।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

আদি—প্রভৃতি। কুল শীল জাতি মান—রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন কুলের ভয় না করিয়া। তাঁহার জন্য তিনি জাতি ধর্ম মান সম্মান সব কিছু বিসর্জন দিয়াছেন। অখিল—বিশ্ব। কালিয়া—কৃষ্ণ। যোগীর—সাধকের।

ভাববস্তু সংক্ষেপ

অঙ্কুর যদি সূর্যের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়, তবে তাহার উপর মেঘ জল বর্ষণ করিয়া কি হইবে। এই নব যৌবন যদি রাধা বিরহ বেদনায় কাটাইবেন, তবে আর প্রিয়ের প্রেম পাইয়া কি লাভ হইবে। কৃষ্ণ এখানে এ কি দুর্দশা সৃষ্টি করিলেন। সাগর নিকটে থাকিতেও যদি কণ্ঠ শুকাইয়া যায়, তবে কে আর পিপাসা দূর করিবে। চন্দন তরু যদি সৌরভ ত্যাগ করে, চন্দ্র জ্যোৎস্নার বদলে অগ্নি বর্ষণ করিবে। চিন্তামণি যদি নিজের গুণ ছাড়িয়া দেয়, তবে অভাগী রাধার আর কি গতি হইবে। শ্রাবণ মাস যদি মেঘ বারি বর্ষণ না করে, কল্পতরু বন্ধ্যার মতো হয়। কৃষ্ণকে সেবা করিয়া যদি আশ্রয় না পাওয়া যায়, তবে বিদ্যাপতি ধাঁধায় থাকিবেন।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

অঙ্কুর—বীজ থেকে উদ্গত কচি উদ্ভিদ। তপন—সূর্য। জারব—দগ্ধ হয়। করিদ—জলবাহী। মেহে—মেঘে। নব যৌবন—নবীন যৌবন। গোঙায়ব—কাটাইব। সো—সেই। পিয়া—প্রিয়। লেহে—স্নেহে। এ নব যৌবন··· লেহে নবীন যৌবন প্রেমিকের ভালবাসায় মিলনে ধন্য হয় সার্থক হয়। সেই নবীন যৌবন যদি বিরহে কাটিয়া যায়, তবে আর প্রিয়ের প্রেম পাইয়া লাভ কি। দৈব—অদৃষ্ট। দুরাশা—নৈরাশ্য। সিন্ধু—সাগর। কণ্ঠ—গলা। শুকায়ব—শুকাইয়া যায়। কো—কে। সিন্ধু নিকটে · পিয়াসা—সাগর নিকটে আছে। তথাপি যদি পিপাসা দূর করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে কে আর পিপাসা দূর করিবে। চন্দন তরু—চন্দন গাছ। যব—যখন। সৌরভ—সুগন্ধি। ছোড়ব—ছাড়িয়া দিবে। শশধর—চন্দ্র। বরিখব—বর্ষণ করিবে। আগি—অগ্নি। চন্দন তরু ··আগি—চন্দন গাছ চন্দনের সুগন্ধ দেয়। যদি কোন কারণে সুগন্ধ দেওয়া বন্ধ করে, তবে বুঝিতে হইবে অনর্থ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলে চন্দ্রও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার বদলে অগ্নি বর্ষণ শুরু করিবে। চিন্তামণি—এমন মণি যাহা দ্বারা সকল বস্তু সুলভ হয়। চিন্তামণি হাতে পাইলে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়। করম—কর্ম। চিন্তামণি·· অভাগি—ভাগ্যদোষে চিন্তামণি যদি নিজগুণ ত্যাগ করে, তবে আর দুর্ভাগ্যের বাকী কি থাকে। মাহ—মাস। ঘন—মেঘ। বিন্দু—বৃষ্টি। না বরিখব—বর্ষণ না করে। সুরতরু—কল্পতরু। ঝাঁঝকি—বন্ধ্যার। ছন্দে—মতো। গিরিধর—কৃষ্ণ। সেবি—সেবা করিয়া। ঠাম—ঠাঁই। পাওব—পাব। রহ—থাকে। ধন্ধে—ধাঁধার মধ্যে।

ব্যাখ্যা

চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা বলিতেছেন যে আজ রাত্রি তাঁহার অনেক সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। তিনি প্রিয়ের সুন্দর চন্দ্রানন দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন যৌবন আজ সার্থক হইয়াছে। দশ দিক নির্দ্বন্দ্ব হইল। আজ তিনি তাঁহার গৃহকে যথার্থ গৃহ বলিয়া মনে করিতেছেন, আজ তাঁহার দেহ যেন প্রকৃত দেহ। আজ বিধি তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, তাহার মনের সব সন্দেহ দূর হইয়াছে। সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, চন্দ্র লক্ষবার উদিত হোক, পঞ্চবান এখন লক্ষবান হোক, মলয়-বাতাস মন্দ মন্দ বহিতে থাকুক। এখন যদি প্রিয়ের সহিত মিলন হয়, তবে নিজের দেহকে রাধা স্বীকার করিবেন। বিদ্যাপতি বলেন যে রাধার প্রেম ধন্যাতিধন্য।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

আজু—আজ। হাম—আমি। ভাগে—ভাগ্য করিয়া; সৌভাগ্যে। পোহায়লুঁ—পোহাইলাম, অতিবাহিত করিলাম। পেখলুঁ—দেখিলাম। পিয়া—প্রিয় মুখ-চন্দা—মুখচন্দ্র। সফল—সার্থক। মানলুঁ—মানিলাম। দিশ—দিক। ভেল—হইল। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব। মঝু—আমার। গেহ—গৃহ। মানলুঁ—মানিলাম। আজু মানলু—রাধার গৃহ এতদিন যেন শ্রীহীন ছিল। কৃষ্ণকে দেখিবার পর তাহা শ্রীযুক্ত হইয়াছে। ভেল—হইল। দেহা—দেহ। আজু··· দেহা—রাধার দেহের এতদিন যেন কোন সার্থকতা ছিল না। কৃষ্ণকে দেখিবার পর তাহার দেহের সার্থকতা তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বিহি—বিধি। মোহে—আমাকে। অনুকূল—সদয়। হোয়ল—হইল। টুটল—দূর হইল। সবহুঁ—সমস্ত। সন্দেহ—সন্দেহ। সোই—সেই। অব—এখন। ডাকউ—ডাকুক। উদয় করু—উদিত হোক। চন্দা—চাঁদ। সোই কোকিল··· চন্দা—রাধা যখন বিরহ-কাতর ছিলেন, তখন কোকিলের গান, চাঁদের আলো তাঁহার কাছে পীড়াদায়ক ছিল। কিন্তু এখন কৃষ্ণের সহিত তাহার মিলন হইয়াছে, তাই এখন আর এই সবে তাহার ভয় নাই। পাঁচবান—পঞ্চবান। হোউ—হোক। মন্দা—মন্দ মন্দ।

ব্যাখ্যা

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহ।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত 'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন জনিত রাধার অন্তরের উল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকাচিপ্পনী

বহুত—অনেক। মিনতি—অনুরোধ। তোয়—তোমাকে। দেই—দিয়া। তুলসী তিল—তুলসী পাতা ও তিল। সমর্পিনু—সমর্পণ করিলাম। জনু—যেন। ছোড়বি—ত্যাগ করিবে। মোয়—আমাকে। গণইতে—গণনা করিতে। লেশ না পাওবি—বিন্দুমাত্র পাইবে না। যব—যখন। তুহুঁ—তুমি। জগন্নাথ জগতের নাথ। কহায়সি—ঘোষণা করিতেছ। জগ—জগত। নহ—নহি। মুঞি—আমি। কিয়ে—কিবা। জগ বাহির·· ছার—আমি তো জগতের বাহিরের কেহ নহি। আমি জগতের ভিতরের। জনমিয়ে—জন্ম গ্রহণ করিয়া। করম বিপাকে—কর্মফলবশত। গতাগতি—যাতায়াত। রহু—থাকে। তুয়া—তোমার। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। ভণয়ে—বলিতেছে। তরইতে—পার হইতে। ভবসিন্ধু—ভবসমুদ্র। তুয়া—তোমার। তিল—মুহূর্ত।

ব্যাখ্যা

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত-'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণের কাছে কবির প্রার্থনা ব্যক্ত হইয়াছে।

কবি কৃষ্ণের পদযুগলে তিল ও তুলসী দিয়ে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার আর নিজের উপর কোন স্বত্ব নাই। তাঁহার প্রার্থনা, কৃষ্ণ যেন দয়া করিয়া তাহাকে ত্যাগ না করেন। তাঁহার জীবনে অনেক দোষ। যদি সে সকল দোষের বিচার করা হয়, তবে লেশমাত্র গুণের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। কবি জানেন, কৃষ্ণ জগতের ঈশ্বর। তিনিও তো জগতের ভিতরে মানুষ। তাই কবির বিশ্বাস, কৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না। কর্মফলের জন্য পরজন্মে মানুষ পশু পাখী অথবা কীট পতঙ্গ—যেরূপেই জন্ম হোক না কেন, সকল রূপেই কৃষ্ণ পদে তাঁহার মতি থাকে, এই তাঁহার প্রার্থনা।

প্রার্থনা

বিদ্যাপতি

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত রমণী-সমাজে।
তাহে বিসরি'মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকলে একলে
না শুনে কাহারও কথা॥

বাহিরের জগতের কোন কথাবার্তা তাহার কানে প্রবেশ করে না। অন্তর্জগতের সমস্ত প্রেমব্যাকুলতা কৃষ্ণের উদ্দেশে সমর্পণ করায় তাহার বাহ্যিক চৈতন্য বিলুপ্ত। এমন কি ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ পর্যন্ত নাই—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

চণ্ডীদাস যেরূপ দক্ষতার সহিত রাধার পূর্বরাগে তাহার ধ্যানগম্ভীর বিষণ্ণ করুণ ভাবময়ী আত্মাধিকা মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তা অন্যত্র দেখা যায় না।

চণ্ডীদাসের সুগভীর হৃদয়বোধ তাহার পদাবলীর মধ্যে বিপ্রলম্ভের করুণ সুর আনিয়া দিয়াছে। একদিকে অপরিসীম আনন্দ ও অন্যদিকে দুঃসহ যন্ত্রণা—এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় যখন বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন প্রেম আপন গতিপথ খুঁজিয়া পায়। চণ্ডীদাস আপন জীবন সমুদ্র মন্থন করিয়া যে প্রেমের সুধাভাণ্ড লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অমর করিতে পারিয়াছিলেন। বিচিত্র জীবন রস রসিকতা তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্যে বিরহের অশ্রু সিঞ্চন করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল।—

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্য-সাধনায় পার্থক্য আছে। চণ্ডীদাস জীবন-দ্রষ্টা, কিন্তু বিদ্যাপতি রূপদ্রষ্টা। একজন জীবনের অতল তলে ডুব দিয়া তাহার অপরূপ ঐশ্বর্যে মোহিত হইয়াছেন, অপরজন রূপের জগতে দেহ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাই উভয়ের রাধা চরিত্র চিত্রনে মত পার্থক্য। চণ্ডীদাসের "রাধা মুগ্ধা নায়িকা নহেন—প্রেম প্রৌঢ়া নারী। আপনার পূর্ণ বিকশিত পরিণত প্রেমিক সত্তাটিকে লইয়া তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ···বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে—কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকে জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যে ভয় এবং দুঃখের প্রতি অনুরাগ। বিদ্যাপতির অনেক স্থলে রাধার সৌন্দর্য বর্ণনার বাহুল্য আছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গম্ভীরতা আছে। চণ্ডীদাসের

জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের মত পূর্বরাগে অবিসংবাদিত কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও আক্ষেপানুরাগে তাঁহার আশ্চর্য সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত। জ্ঞানদাস প্রকৃতপক্ষে আক্ষেপানুরাগেরই কবি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষায় "জ্ঞানদাস নায়িকা অপেক্ষা নায়কের রূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে বা অলংকার শাস্ত্রে নায়কের রূপের কোন আদর্শ নাই সুতরাং জ্ঞানদাস অনেকটা স্বাধীনভাবেই নায়কের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই রূপ কল্পনায় শুধু অলঙ্কার সজ্জা বর্ণনা বা বাঁধা ধরা উপমারই প্রয়োগ নাই, আছে মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টিতে সৌন্দর্যান্তরঙ্গের সচল প্রবাহ। শ্রীকৃষ্ণের রূপকে যমুনা তরঙ্গে আন্দোলিত চন্দ্র প্রতিবিম্বের সহিত এ উহার রক্ত-চন্দন চর্চিত শ্যামদেহকে কালিন্দীর জলে ভাসানো অথবা পুষ্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস নায়িকার রূপ অপেক্ষা তাঁহার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণ নাম জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদে আবেগের সহিত দর্শনিক তত্ত্ব ও আধুনিক অন্তর্দৃষ্টিশীল কল্পনা—মননের কিছুটা সংমিশ্রন আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের পদে উভয়েই মানবজীবনের সীমা ছাড়াইয়া ভাবাদর্শের উর্দ্ধলোকে বিচরণ করিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসের ও অনুভূতির গভীরতায় চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব। পদাবলী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্ঠা এই দুই মহাকবির রচনায় উদাহৃত হইয়াছে।"

জ্ঞানদাস রূপ-মন্ময় কবি। বিদ্যাপতির মত তিনি রূপকে চক্ষুদ্বয়ের-সীমানাতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই; তিনি রূপকে হৃদয়ের গহন রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

রূপের সমুদ্রে চোখ ডুবিল, তাহার ফলে যৌবনের আলো আঁধারি হৃদয় অরণ্যে মন হারাইয়া গেল। মনের উপর তাহার যেন আর কোন অধিকার নাই। তাই যে পথ ধরিয়া রাধা প্রতিদিন অসংখ্যবার যাতায়াত করিয়াছেন, সেই পথ আজ তাহার কাছে অচেনা—প্রেমের ব্যাকুলতা সেই পথকে দীর্ঘ অফুরন্ত করিয়া দিয়াছে—

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ॥

জ্ঞানদাসের পদে রূপ আছে, সেই সঙ্গে আছে রূপের আবেশ; হৃদয় আছে, সেই সঙ্গে আছে হৃদয়ের আনন্দ-যন্ত্রনা। প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমজর্জরিত দেহ-মনের সুগভীর আনন্দ-যন্ত্রণা মিশ্রিত আকুতি তাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

পদাবলী ছাড়া বিদ্যাপতি আরও বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐগুলি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, পরিমার্জিত ও বিদগ্ধ সৌন্দর্য দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি অনুকূলনীয় কবিত্ব প্রতিভার পরিচায়ক। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা অবলম্বন করিয়া তিনি কত যে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদ্যাপতি সর্বাংশে রূপ সচেতন শিল্পী। তাঁহার কাব্যদৃষ্টি সৌন্দর্য-চেতনা সঞ্জাত। দুই চোখ ভরিয়া তিনি জীবন ও জগতের সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আপন সচেতন শিল্প-মানসের পরিমণ্ডলে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজসভার বিলাসবর্ণাঢ্য পরিবেশ তাহার পদাবলীকে মণ্ডন কলাসমৃদ্ধ করিয়াছে।

বিদ্যাপতি রাধা চরিত্র পরিকল্পনায় আশ্চর্য সচেতন শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার রাধা বিদ্যুৎচঞ্চলা কলাবতী কমলিনী রাধা। চণ্ডীদাসের রাধার মত তিনি সর্বত্যাগিনী যোগিনী বা জ্ঞানদাসের রাধার মত বিরহভয়-কম্পিতা নহেন। লীলাচঞ্চল কৈশোরের দিনগুলি হইতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া যৌবনের স্থির সংযত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কৈশোরের অপরিস্ফুট কমলদল ধীরে ধীরে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া যৌবনের অপরিসীম মুক্তির মধ্যে তাহার স্বর্ণকমল দল মেলিয়া দিয়াছে। বিদ্যাপতির পথে রাধার ক্রমবিকাশের স্তরটি যেমন মনস্তত্ত্বসম্মত, তেমন কাব্যকুশলতা পরিচায়ক।

বয়ঃসন্ধির পদ—

বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। বয়ঃসন্ধি মানবজীবনে এক বিচিত্র সময়। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানবচিত্ত বিচিত্র এক রহস্যময় আলোছায়ার স্পন্দনে দোলায়িত হয়। একদিকে থাকে কৈশোরের লীলাচঞ্চল আনন্দ উচ্ছলতা, অন্যদিকে থাকে অজ্ঞাত যৌবন রহস্যের প্রতি ভয়চকিত আকর্ষণ—দেহ ধীরে ধীরে জাগিতে সুরু করিয়াছে, অথচ হৃদয়ে তাহার কোন সাড়া নেই। ভয়, বিস্ময়, লজ্জা, আনন্দ, বেদনা—এই সকল বিচিত্র ভাবের সম্মেলনে বয়ঃসন্ধিকাল মানবজীবনে স্বল্পকাল স্থায়ী দুর্লভতম মুহূর্ত। এবং রাধা চরিত্রের এই দুর্লভতম মুহূর্তের চিরন্তন চিত্র অপূর্ব রঙে রেখায় সার্থকভাবে ধরা পড়িয়াছে জীবনরসিক বিদ্যাপতির কাব্যে।

জীবন হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য লইয়া বিদ্যাপতি যে তিলোত্তমা রাধা গড়িলেন, সে রাধা তাঁহার অন্তরবাসিনী বিচিত্ররূপিণী মানসী প্রতিমা। জগতের মধ্যে কবি তাহাকে অসংখ্য বিচিত্র-রূপে দেখিলেও অন্তরমাঝে তাহার একাকিনী স্থির প্রশান্ত আবির্ভাব। রাধা তাহার সৌন্দর্যলক্ষ্মী। মুগ্ধ আবেশ লইয়া তিনি এই সৌন্দর্য-প্রতিমার দেহে রহস্যময় যৌবনের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন—

"খনে খনে নয়ন কোন অনুসরই
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরই॥
খনে খনে দশনছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥"

পাঠ করিয়া আমি পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মনে হইতেছে যেন আমি অমৃত পান করিয়াছি।"

গোবিন্দদাসের আদি নিবাস ছিল কুমার গ্রামে। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়াবুধুরী গ্রামে বসবাস করেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শোনা যায়, যৌবনে তিনি বিদ্যাপতির জন্মভূমি মিথিলায় বিসফি গ্রামে যাইয়া বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করেন। বিদ্যাপতির কবিধর্মের সহিত তাহার আত্যন্তিক সাদৃশ্যের জন্য তিনি দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে পরিচিত। বৈষ্ণব কবি বল্লভদাস তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শীলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অভিসার ও মাথুরের পদে গোবিন্দদাস বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অভিসারের পদে গোবিন্দদাস বলিতে গেলে তুলনাহীন।

গোবিন্দদাসের পদাবলীতে আবেগের সহিত সংযমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। চৈতন্যদেবের লোকোত্তর জীবনলীলার আলোকে রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমলীলা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার অন্তরমানসে দুরন্ত প্রাণাবেগ সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু গোবিন্দদাসের প্রধান কৃতিত্ব, তিনি সেই প্রাণাবেগকে স্থির সংযত সৌন্দর্যশিল্পে রূপায়িত করিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্র অলংকারে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাহার পদাবলীকে বিশেষ একটি আভিজাত্য এবং শিল্পশ্রী আনিয়া দিয়াছে।

গোবিন্দদাস রূপ-সৌন্দর্যসাধক স্থাপত্যধর্মী কবি। দুই চোখ ভরিয়া তিনি সৌন্দর্যসুধা পান করিয়া তাহাকে হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে পুনরায় তিল তিল করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। এখানেই বিদ্যাপতির সহিত তাহার সাদৃশ্য। বিদ্যাপতির মত তাঁহার রাধা সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কবির মানস-প্রতিমা। কবির হৃদয় পদ্মবনে নিরন্তর ইহার আরাধনা। তবে বিদ্যাপতির রাধা অনেকাংশে মানবী গুণসম্পন্না—গোবিন্দদাসের রাধা সেই জায়গায় বস্তুনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমূর্তি। পৃথিবীর ধূলা মাটির সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ইহা ছাড়া শুচিস্নিগ্ধ ভক্তিপ্রাণতা গোবিন্দদাসের পদাবলীর আর এক বৈশিষ্ট্য। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীর মধ্যে তিনি আপন ভক্ত হৃদয়ের সকল আকুতি নিঙরাইয়া চৈতন্যের অপরূপ ভাবমূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অনবদ্য চিত্র-ধর্মিতার প্রকাশে গোবিন্দদাসের পদাবলী অনন্য গৌরবে ভাস্বর।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলীতে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। গৌরাঙ্গদেবকে তিনি দেখেন নাই, তথাপি তিনি এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে যুগ হইতে চৈতন্যদেবের জীবনকাল খুব বেশী দূরে ছিল না। 'রাধাভাবদ্যুতি' কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বিরাটত্ব ও তীব্রত্ব তিনি ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। চৈতন্য সম্পর্কিত

গাঢ় ভাবব্যঞ্জনা ও আশ্চর্য শিল্পচাতুর্য। তাঁহার অভিসারের পদাবলীর দুর্দম গতিশক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার রাধা সত্যই কৃষ্ণ-আরাধিকা। দুর্গম পথের দুঃসাধ্য সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি পাঠকের মনে দুর্দম গতিবেগের আবেগ ছড়াইয়া তাহাদের মোহাবিষ্ট করিয়া রাখেন। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদাবলী যথার্থ ই অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টিকর্ম।

প্রশ্ন ৫।—পূর্বরাগ কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠ পদকর্তা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।—প্রেমাসক্ত নরনারীর জীবনে পূর্বরাগের গুরুত্ব অসাধারণ পূর্বরাগের স্বর্ণসূত্র ধরিয়াই তাহাদের জীবনযৌবনে প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। পূর্বরাগ মিলনের গৌরচন্দ্রিকা। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনা শ্রবনাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ মিলনের পূর্বে পারস্পরিক রূপ দর্শন বা গুণশ্রবন প্রভৃতির দ্বারা পরস্পরের মনে যে রতি উৎপন্ন হয়, তাহাই পূর্বরাগ নামে অভিহিত।

কবি কর্ণপুর পূর্বরাগকে আটভাগে ভাগ করিয়াছেন। দর্শন তিন প্রকার—সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপট দর্শন বা স্বপ্নে দর্শন। শ্রবণ পাঁচ প্রকার—ভাট মুখে শ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, সঙ্গীতে শ্রবণ ও বংশীধ্বনিতে শ্রবণ।

নায়ক-নায়িকার মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শনে অনুরাগ জন্মিতে পারে। [Love at the first right] সাক্ষাৎ দর্শন জনিত আনন্দে প্রাণমন বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ॥ [জ্ঞানদাস]

স্বপ্নে অনুরাগ জন্মাইবার নিদর্শন—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ
কো পাতিয়াব স্বপন স্বরূপ॥ [বিদ্যাপতি]

শ্রবণের মাধ্যমে নায়ক নায়িকার হৃদয়ে পূর্বরাগ সঞ্চারিত হইবার সার্থক উদাহরণ চণ্ডীদাসের পদে মেলে—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ অবলম্বনে অসংখ্য সুন্দর পদ রচিত হইয়াছে। রাধার পূর্বরাগই কবিগণের নিকট বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মে রাধা কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। তিনি শ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণকে প্রেমানন্দরস পান করাইবার জন্যই তাঁহার অস্তিত্ব। জন্মাবধি তিনি

কৃষ্ণকে প্রাণ-মন সমর্পন করিয়াছেন। কৃষ্ণের আরাধনার জন্ত তিনি রাধিকা। চৈতন্ত চরিতামৃতে তাই বলা হইয়াছে—

হ্লাদিনীর সারাংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব স্বরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

সুতরাং রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণ যে তাহাদের অনেক কবিত্বশক্তি নিয়োজিত করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ভাবের গাঢ়তায়, বিষয়-বস্তুর লালিত্যে ও কবিহৃদয়ের আন্তরিকতায় পূর্বরাগের পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্য-সমুদ্রে প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মত বিরাজমান।

প্রাক্ চৈতন্ত ও চৈতন্ত পরবর্তী কবিবর্গের পূর্বরাগবিষয়ক পদাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। বড়ু চণ্ডীদাসের—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে কৃষ্ণের হৃদয়ে যে মিলনের আকাঙ্খা জাগিয়াছে, তাহাকে সংজ্ঞানুযায়ী পূর্বরাগ বলা গেলেও তাহা জৈব চাহিদা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহার তুলনায় চৈতন্ত পরবর্তী কবি জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের সুর কত স্বতন্ত্র! পূর্বরাগের প্রকৃত অস্তিত্ব দেহে নহে—হৃদয়ে। বরঞ্চ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডে রাধার আকুলতার মধ্যে যেন প্রকৃত পূর্বরাগের সুর ধ্বনিত হইয়াছে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর যে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

বিদ্যাপতির রাধাও বয়ঃসন্ধির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে যৌবনচেতনায় জাগিয়া উঠিয়া কৃষ্ণের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন—

শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন গেল॥
.....
সুনইতে রসকথা যাপয়ে চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনত সঙ্গীত॥

বিদ্যাপতির রাধাও প্রধানত দৈহিক রূপকে আশ্রয় করিয়া পূর্বরাগের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতির পূর্বরাগ বর্ণনা দেহাশ্রয়ী—

কি কহব রে সখি কানুকরূপ।
কো পাতিয়াব অপনসরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসন সৌদামিনি রেহ॥
নামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সুবেশ॥

রাধাকৃষ্ণের অভিসার, বিরহ প্রভৃতি বিষয়ের পদাবলী সম্পর্কেও এই একই ব্যাপার। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ কৃষ্ণভাব লইয়াও বহু গৌরপদাবলী রচনা করিয়াছেন। এ সকল পদে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণভাবের সাধক। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কালীয়-দমন, পূর্ব গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ প্রভৃতি বিষয় কীর্তন করিবার পূর্বে উপরোক্ত গৌরচন্দ্রিকা গীত হয়।

কীর্তন গানের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার প্রধান কারণ: বিচিত্র জন-মণ্ডলী পূর্ণ আসরে চৈতন্যের লোকোত্তর জীবন প্রভাব পূত আধ্যাত্মিক ভাব পরিবেশ সৃষ্টি করা। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রেমলীলা বৈচিত্র্য সাধারণ শ্রোতার নিকট প্রাকৃত প্রেমাশ্রিত বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ সাধারণ শ্রোতার নিকট রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যময় দিকটি সাধারণত অনাবিষ্কৃত থাকে। তাই কীর্তনের ভূমিকা স্বরূপ গৌরচন্দ্রিকা গীত হওয়ায় সমস্ত পরিমণ্ডলে গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গৌরচন্দ্রিকার আলোকে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা প্রাকৃত নরনারীর কামনা-বাসনাপূর্ণ প্রেমলীলা হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়া শ্রোতার মনে এক অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের বাণী বহন করিয়া আনে। গৌরচন্দ্রিকা প্রাকৃত লীলা সঙ্গীতকে Mystic Interpritation দান করে। শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গরূপে ধূলার ধরণীতে বিচিত্র লীলা করিয়া গিয়াছেন, শ্রোতার মনে এই ভাবটি জাগ্রত হয়। কীর্তনের প্রারম্ভে গৌরাঙ্গদেবের পবিত্র জীবনলীলা স্মরণ করিলে হৃদয় নির্মল পবিত্র হইয়া যায়। ইহার ফলে শ্রোতা বৃন্দাবন লীলার যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারেন। রায় রামানন্দের ভাষায়—"গৌরচন্দ্রিকা ব্রজলীলার পরমাণুর একবিন্দু কর্পূর।"

প্রশ্ন ৮।—ব্রজবুলির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।—ব্রজবুলি কোন বিশেষ দেশের ভাষা নহে। ইহা একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা—শুধুমাত্র বৈষ্ণব পদ-রচনার ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার। ব্রজবুলির সৃষ্টি হইয়াছে মিথিলায় এবং ইহা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে বাঙলা দেশে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ—এই দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া ব্রজবুলির ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে। তবে ব্রজবুলি নামটি সাম্প্রতিক কালের উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আর্য ভাষাভাষীদের মধ্যে আর্যাবর্তের কথ্য ভাষার সার্বভৌম সাধুরূপকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্য রচনার ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এক নাম অবহট্‌ঠ। এই লৌকিক ভাষা হইতেই ব্রজবুলির সৃষ্টি। বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যায় এককালে ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনার ব্যাপক অনুশীলন ছিল। সম্ভবত মৈথিল কবি উমাপতি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাবে ইহা হইয়াছিল। তাই প্রাচীন মৈথিলী ও ব্রজবুলির মধ্যে ঘনিষ্ট সাদৃশ্য।

"তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য ব্রজবুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব। ব্রজবুলির ছন্দ মাত্রামূলক, এবং পদান্ত অ-কার অলুপ্ত। সুতরাং ব্রজবুলি কবিতায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার যথেচ্ছ ও নির্বাধ। এই কারণে এবং লৌকিক মূলকতার জন্য অর্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগও খুব আছে। বৈদেশিক আরবী-ফারসী শব্দ ব্রজবুলিতে নাই।" [ডঃ সুকুমার সেন।]

'ব্রজবুলি' সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে ইহা ব্রজের অর্থাৎ বৃন্দাবনের বুলি বা কথা। অনেকের বিশ্বাস রাধাকৃষ্ণ এই ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন। কিন্তু ইহা একেবারেই অর্থহীন। রাধার বাস্তব অস্তিত্বই যেখানে নাই, সেখানে তাঁহার কথা বলিবার মাধ্যম যে 'ব্রজবুলি' হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। বৃন্দাবনবাসী কোন দিনই ব্রজবুলিতে কথা বলে নাই। ইহা একান্তভাবে বৈষ্ণব পদ রচনার ভাষা—বাঙলা, আসাম ও উড়িষ্যার অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের অন্যতম ফলশ্রুতি।

বাঙলা সাহিত্যে ব্রজবুলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পদ রচিত হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, যশোরাজ খাঁন সর্বপ্রথম ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন—

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আর পয়োধর গোর'

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে ব্রজবুলির বিশেষ প্রচলন হয় নাই। তাঁহার তিরোধানের পর 'ব্রজবুলি' ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির রচনায় ব্রজবুলির নিদর্শন আছে—

তপন কিরণ যদি অংকুর দগধিল কি করব জল অভিষেকে।
দখভরে প্রাণ বাহির যদি নিকসিব কি করব ঔষধি বিশেখে॥

চৈতন্য পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও রায়শেখর ব্রজবুলিতে পদ-রচনায় অসামান্য সাফল্যলাভ করিয়াছেন—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা তরুণ-চরণ চল চলই
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল থলই॥

[গোবিন্দদাস]

কিংবা—

পাখ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখে কত ভেল॥

[জ্ঞানদাস]

বাঙালী কবিগণ 'ব্রজবুলি' এত স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে মনে হয়, ইহা যেন তাঁহাদের মাতৃভাষা। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য 'ব্রজবুলি' এককালে ব্যাপকভাবে সমগ্র পূর্ব ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

১। ঔদার্যগুণ: 'ব্রজবুলি'র ঔদার্যগুণের জন্যই সম্ভবত বৈষ্ণব কবিগণ ব্যাপকভাবে ইহার অনুশীলন করিয়াছিলেন। ব্রজবুলির উদারতা ও নমনীয়তার জন্য যে কোন প্রাদেশিক ভাষার শব্দ ইহার মধ্যে অতি সহজে সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারিয়াছে। সকল প্রদেশের কবিগণ ইহার মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে পারিয়াছেন।

রাধার অভিসার গোবিন্দদাসের পদে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে।

প্রশ্ন ১২। সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া উদাহরণ দাও—

প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ ও নিবেদন।

উত্তর। প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রেমবৈচিত্ত্য হইতেছে প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ের বিচিত্র একটি ভাব। প্রেমিক নিকটেই অবস্থান করিতেছে, তথাপি প্রগাঢ় প্রেমব্যাকুলতায় প্রেমিকার মনে হয়, এই বুঝি প্রেমিককে তিনি হারাইয়া ফেলিতেছেন। ইহার ফলে হৃদয়ে যে বিরহবোধ জনিত বেদনার সৃষ্টি হয়, তাহাকেই বলা হয় প্রেমবৈচিত্ত্য। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়াতিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মিষ্যতে ॥

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ প্রেমবৈচিত্ত্য অবলম্বন করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। রাধা কৃষ্ণকে মন-প্রাণ দিয়া ভালোবাসেন। তথাপি কৃষ্ণের প্রতি তাহার অনুযোগের শেষ নাই—

বঁধু, কি আর বলিব তোরে,
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে।

প্রেমের জ্বালা বড় কঠিন। এই প্রেমের জ্বালায় জ্বলিয়া রাধা বলেন—

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥

আক্ষেপানুরাগ

'আক্ষেপানুরাগ' প্রেমবৈচিত্ত্যেরই একটি অবস্থাভেদ। প্রেমিকের প্রতি তীব্র অনুরাগবশতঃ আক্ষেপ বা খেদোক্তি—ইহাই হইতেছে আক্ষেপানুরাগ।

কৃষ্ণকে রাধা প্রাণাধিক ভালোবাসেন তাঁহার উদ্দেশে তিনি দেহ-মন-প্রাণ নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়াছেন। তথাপি কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুযোগের সীমা নাই। শুধু কৃষ্ণের প্রতি নয়, কৃষ্ণের মুরলীর প্রতি, কালো রঙের প্রতি, সখীগণের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি, এমন কি নিজের প্রতিও তাঁহার আক্ষেপ।

আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। রাধার কৃষ্ণ অন্ত প্রাণ। কৃষ্ণের বাহিরে তাঁহার জীবনের অস্তিত্ব নাই। কৃষ্ণেরও যে রাধা অন্ত প্রাণ, তাহা তিনি জানেন। এবং জানিয়াও বলিয়াছেন—

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥...

আদেশিলা ;—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুষ্কর ! এখনও কাঁপে হিয়া মম
স্মরণে, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে,
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে, কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর ঘোর দণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
বনে যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলঙ্কুল অম্বরপ্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা, বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?
এই রূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ ! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্বদুঃখ ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর,—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ
আরম্ভিল ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা ঘন্দ্ব বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে
অযুত ! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে !—
আর কি কহিব, দেব ? পূর্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি ! হায়রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই
মোরে ?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হেমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃমণি,
বিপু প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ;—"সাবাসি, দূত ! তোর কথা
শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী ! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, গুহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা
পুরী !—
হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রঙ্গঃ-ছটা,
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষুঃ-বিনোদন,

যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ-রতন-পূর্ণ, এ জগতে যেন
আনিয়া নিধির ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীকর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, তার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উচ্চ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি ভূবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ ! শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা। অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা
বিবাদে,
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে
রক্তস্রোতে।
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
চূর্ণ রথ, অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে ! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনু,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ-দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য কত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !
পড়িয়াছে বীরবাহু— বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একঘ্নী বাণ বক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা
রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে
দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরী !

কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলবভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধুপানে চাহি ;—
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি, প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে,
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য সাধে
বীতংসে, এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি ;
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি কিঙ্কিণীর রোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু, অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী, কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
কোঁদে, বোসে, যৌবাবিক নিষ্কোষিলা
অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
‘একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি পূজিতাম তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তস্কর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ
তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে
ধনে ?”

মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে ; আর বীর যত হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে ; পুনঃ তারে সেনাপতি পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব : কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহী নাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র ! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃকুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি !'

এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা , আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে।
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি !

কহিলেন সুরীশ্বর ; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে ? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি ! এ
দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার ! সর্বশুচি-বরে,
সর্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"

কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী,—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার ; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে !
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লঙ্কারে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে। কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে ?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে !
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোনার প্রতিমা, যথা ! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে !

আনিলা মাতলি রথ , চাহি শচী-পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুরবচনে
একান্তে, "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি।
পরিমল সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার ! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।

স্বর্ণ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর-নিনাদে
অমনি ! বাহিরি বেগে, শোভিল
আকাশে
দেববান , সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে
উদিলা ! ডাকিল ফিঙা ; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে !
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে !

মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী

তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে?
একাকী প্রদ্যুম্নে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে—
প্রফুল্লিত কুলকুল; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইলা ধাইয়া;
বহিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে
মনসিজে
ইহা হ'তে!) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর জাল;—প্রেমামোদে মাতিলা
ত্রিশূলী!
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু!
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব;—"জানি আমি,
দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের
গতি?
পাঠাও কামেরে উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ নীড় ছাড়ি
উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনসার—কমল, কুমুদ,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেব মহাদেবী সহ।
হিরণ্ময়-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেনকালে মধু-সখা উতরিলা তথা
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুকাইল অশ্রু-বিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে শারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তায় পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব-নামে নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্বকথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর
কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে,
উত্তরিলা পঞ্চশর; "ছায়ার আশ্রয়ে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর-নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কতক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,

প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা ; "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি, শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ;
বদ্ধ ক্ষণকাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে !" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল দর্পী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা)
নড়িছে
অস্থিরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে,
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল ! কাঁপিল মহী ; গর্জ্জিল
জলধি !
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণ-রঙ্গে মাতি !
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত ; হাসিল
ক্ষণপ্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগারি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে ; মহা ঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টির শিলা তড়-তড়-তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার
ঘরে।
যথায় শিবির-মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উত্তরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে !
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে,
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা ; "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা-রূপে ?—কেন হেথা
আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায় !" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি,
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্র ; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে !
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে
কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া !"
কহিলা রঘুনন্দন ; "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ-সংবাদে !
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব,
কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি
তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত ; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি ;
নিত্য সত্য-সেবী-সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক [illegible]

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া নানাবিধ কাজের সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও শুরু করেন। পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে রচনা করিলেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। একে একে প্রকাশিত হইল 'পদ্মাবতী' 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', 'কৃষ্ণকুমারী', 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' 'বীরাঙ্গনা কাব্য।' স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি শিক্ষিত বাঙালী চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

কলিকাতায় মধুসূদন কবিখ্যাতি লাভ করিলেও আর্থিক সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করিলেন। ফ্র্যান্সে বাসকালে তিনি তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাগুলি রচনা করেন। দেশে ফিরিয়া ব্যারিস্টারি করিয়াও তিনি আশানুরূপ অর্থ উপার্জন করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। হেনরিয়েটাও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন তিনি চিরবিদায় লইলেন।

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মধুসূদন অসাধারণ কবিপ্রতিভার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কবিমানস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবকল্পনার বিভিন্ন বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে। একদিকে তিনি যেমন বাল্মীকি কালিদাস কৃত্তিবাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবি রচিত বিশিষ্ট কাব্য হইতে তাঁহার কবিমানসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, অন্যদিকে হোমার মিল্টন, ট্যাসো প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাকবিদের কাব্য হইতেও তাঁহার কবিসত্তার উপযোগী উপকরণ গ্রহণ করিয়াছে। মাতা জাহ্নবী দেবীর প্রভাবে বাল্যকালেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি কাব্যের কাহিনী তাঁহার মানসলোককে উদ্দীপিত করিত। মধুসূদন জীবনীকার যোগেন্দ্রনাথ বসু এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন "জাহ্নবী দেবী তৎকালেও লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাংলা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত কণ্ঠস্থ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের নানা অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন আট দশ বৎসর বয়সের সময় মাতাকে এবং অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই গ্রন্থপাঠ করিয়া শুনাইতেন, এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্তন দুগ্ধের সহিত যাহা শিক্ষা করে, জীবনে তারা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না। মধুসূদনের জীবনে এ কথা অতি সুন্দর ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষার এবং বহু গ্রন্থের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও মাতৃ প্রদত্ত শিক্ষার ফলে বাঙ্গালা রামায়ণ এবং মহাভারত সম্পর্কে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও খর্বতা হয় নাই।" ইহা হইতে বুঝা যায়, মধুসূদন রামায়ণ মহাভারত হইতে বাল্যকালেই তাঁহার কবিমানসের উপযোগী প্রাণরস লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যের—ব্যাপক গভীর অনুশীলন তাঁহার ভাব-

যুগ যুগ ধরিয়া যাহা পাঠ করিয়া অমৃত পানের আনন্দ লাভ করিবে। **কনক আসন**—স্বর্ণ সিংহাসন। **দশাননবলী**—বলবান ক্ষমতাশালী রাবণ। **হেমকূট**—হেমকূট নামক পর্বত। **হৈমশিরে**—স্বর্ণকান্তিযুক্ত মস্তকে। **শৃঙ্গবর**—বিরাট চূড়া। **হেমকূট যথা**—রাবণ স্বর্ণ সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহাকে মনে হইতেছে হেমকূট পর্বতের স্বর্ণবর্ণ মস্তকে যেন বিশাল চূড়া। **তেজঃপুঞ্জ**—তেজের আধার। **পাত্রমিত্র**—সভাসদ ও বন্ধুবৃন্দ। **নতভাবে**—মাথা নত করিয়া। **ভূতলে**—পৃথিবীতে। **অতুল**—তুলনাহীন। **স্ফটিক**—মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। **মানস সরস**—মানস সরোবর। **মানস সরসে যথা**—রাবণের রাজসভা স্ফটিকে গঠিত। তাহাতে নানারূপ মূল্যবান রত্নরাজি শোভা পাইতেছে। মনে হইতেছে মানস সরোবরে যেন অপূর্ব সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া আছে। **ফণীন্দ্র**—নাগরাজ বাসুকী। **ফণীন্দ্র যেমতি ধরারে**—রাবণের রাজসভার স্বর্ণছাদ ধারণ করিয়া আছে শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণাঢ্য স্তম্ভ। মনে হইতেছে, নাগরাজ বাসুকী যেন সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। **ঝলিছে**—ঝলিতেছে। **ঝলি**—ঝলমল করিতেছে। **মুকুতা**—মুক্তা। **পদ্মরাগ**—তাম্রবর্ণ মূল্যবান মণি। **মরকত**—হরিৎবর্ণ মূল্যবান মণি। **ব্রতালয়ে**—উৎসব গৃহে। **ক্ষণপ্রভা**—বিদ্যুৎ। **মুহুঁ**—ক্ষণে ক্ষণে। **রতন সম্ভবা বিভা**—রত্নসমূহ হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতি। **ক্ষণপ্রভা সম ঝলসি নয়নে**—ঝালরের উপর রত্নরাজি খোদাই করা আছে। বাতাসের দোলায় ঝালরটি এদিক ওদিক চলিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে রত্নরাজি হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহাতে চোখ যেন ঝলসাইয়া যাইতেছে। **সুচারু**—সুন্দর। **চামর**—চামরী গাভীর লেজ হইতে প্রস্তুত বাতাস করিবার ব্যজন বিশেষ। **কিংকরী**—পরিচারিকা। **চুলায়**—দোলায়। **মৃণালভুজ**—মৃণালের মতো বাহু। **আন্দোলি**—আন্দোলন করিয়া। দোলাইয়া। **চন্দ্রাননা**—চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার। **ছত্রধর**—রাজার পিছনে বিশাল ছাতা ধরিবার কর্মী। **হরকোপানলে রূপে**—রাবণের মাথার উপর যে কর্মী ছাতা ধরিয়া আছে, তাহাকে দেখিতে এত সুন্দর যে মনে হইতেছে কন্দর্পদেব শিবের রোষের আগুনে দগ্ধ না হইয়া রাবণের মাথার উপর ছাতা ধরিয়া আছে। [এখানে একটি পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বর্গরাজ্য দৈত্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। শিবপুত্র ব্যতীত কেহই দৈত্য বধ করিতে পারিবেন না। শিব যোগাসনে মগ্ন। পার্বতীর সহিত মিলিত না হইলে পুত্র জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। তাই দেবতারা যুক্তি করিয়া কন্দর্পদেবকে শিবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য। কন্দর্পদেব পুষ্পধনু হইতে বাণ নিক্ষেপ করিলে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। ক্রোধে তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে অগ্নিশিখা ছুটিয়া গেল। কন্দর্পদেব দগ্ধ হইলেন।] **দৌবারিক**—দ্বারপাল। **রুদ্রেশ্বর**—মহাদেব। **পাণ্ডব শিবিরে শূলপাণি**—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে মহাদেব যেমন রুদ্রমূর্তিতে পাণ্ডব শিবিরে পাহারা দিতেন, রাবণের দ্বারপালকেও সেইরূপ রুদ্রমূর্তি ভয়ংকর দেখাইতেছে। **মন্দে মন্দে**—ধীরে ধীরে।

অহিষী। **আরাব**—সমুদ্রের গর্জন। **জলেশ পাশী**—পাশ অস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। **বায়ুবৃন্দে**—প্রচণ্ড বাতাসে। **প্রভঞ্জন**—বায়ু। **বৈদেহী**—সীতা। **বিগ্রহ**—সংগ্রাম। **চটুলা সফরী**—চঞ্চল পুঁটিমাছ। **রজঃকান্তি**—রূপালি রঙ। **বিভাবসু**—সূর্য। **বসন্তানিল**—মলয় বায়ু। **সুস্বরে**—সুমিষ্ট স্বরে। **দীপিছে**—জ্বলিতেছে। **সুরভি** সুগন্ধ। **খদ্যোতিকাদ্যোতি**—জোনাকির আলো। **ইন্দিরা**—লক্ষ্মীদেবী। **বিস্তারিয়া**—স্থাপন করিয়া। **মুরলা**—বারুণীর সহচরী। **হরির উরসে**—নারায়ণের বক্ষদেশে। **বারীন্দ্রাণী**—বারুণী। **পাশী প্রণয়িনী**—বারুণী। **যাদঃপতি**—সমুদ্র। **চলোর্ম্মি**—উত্তাল তরঙ্গ। **যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে**—যেমন উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রতীর যেমন প্রতিনিয়ত ধ্বসিয়া পড়িতেছে, অধর্মাচারের আঘাতে রাবণও তেমনি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। **অকম্পন** জনৈক রাক্ষস সৈন্য। **প্রমদাকুল**—নারীবৃন্দ। **দুকূল বসনা**—পট্টবস্ত্র পরিহিতা। **কাঞ্চী**—মেখলা। **ক্ষুণ**—ক্ষীণ। **চক্রনেমি**—চাকার পরিধি। **অধীরিয়া**—অধীর করিয়া। **বসুধা**—পৃথিবী। **দন্তী** হস্তী। **নিক্কণে**—বাদ্যধ্বনিতে। **কেতু**—পতাকা। **কুসুম-আসার**—পুষ্পবৃষ্টি। **ত্রিদিববিভব**—স্বর্গের ঐশ্বর্য। **বাসব**—ইন্দ্র। **সুরাধিপ**—ইন্দ্র। **প্রক্ষেড়ন**—লোহধনু। **কালনেমি**—রাবণের মাতুল। **তালজঙ্ঘা**—রাক্ষস বিশেষ। **প্রমত্ত**—রাক্ষস বিশেষ। **মহীরুহ ব্যূহ**—বৃক্ষের ব্যূহ। **মুক্তালয়**—মুক্তার প্রাসাদ। **শিখণ্ডিনী**—ময়ূরী। **অখিণ্ডল ধনু**—ইন্দ্রধনু। **মঞ্জু**—মনোহর। **বাসবত্রাস**—ইন্দ্রের ভীতি স্বরূপ। **বৈজয়ন্ত ধাম**—ইন্দ্রপুরী।

নন্দনকানন—ইন্দ্রের উদ্যান। **নিষঙ্গ**—তীর রাখিবার আধার, তূণীর। **যমুনে**—যমুনা নদীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে।' **প্রভাবা**—মেঘনাদের ধাত্রীর নাম। **কুণ্ডল**—কর্ণের অলঙ্কার। **রথীন্দ্রর্ষভ**—শ্রেষ্ঠ রথী। **হৈমবতী সুত**—কার্তিকেয়। **কিরীটী**—অর্জুন। **বিরাটপুত্র**—বিরাট রাজার পুত্র উত্তর। **উদ্ধারিতে**—উদ্ধার করিতে। **ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী**—ইন্দ্রধনুর মতো ধ্বজা। **তুরঙ্গম**—অশ্ব। **আশুগতি**—দ্রুতগতি। **প্রমীলা**—মেঘনাদের পত্নী। **হেমলতা**—স্বর্ণলতা। **তরু কুলেশ্বর**—বিরাট বৃক্ষ। **ভ্রততী**—লতা। **দৃঢ়বাঁধে**—দৃঢ় প্রেমের বন্ধনে। **রথবর**—বিশাল রথ। **হৈমপাখা**—সোনার পাখা। **মৈনাক শৈল**—হিমালয় ও মেনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পর্বত। ইহার পাখা ছিল। ইন্দ্র ইহার পাখা কাটিয়া দিয়াছিলেন। **শিঞ্জিনী**—ধনুকের গুণ। **ভৈরবে**—ভীষণ শব্দে। **কৈশিক ধ্বজ**—রেশম বস্ত্র নির্মিত ধ্বজা। **কাঞ্চন কঞ্চু বিভা**—সোনার কবচের জ্যোতি। **মায়া**—চাতুরী। **বাম**—প্রতিকূল। **ডরাও**—ভয় পাও। **ঘুষিবে**—প্রচারিত হইবে। **মেঘবাহন**—ইন্দ্র। **রুষিবেন**—ক্রোধ করিবেন। **দুইবার আমি হারানু রাঘবে**—মেঘনাদ দুইবার রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। একবার রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্দী করিয়াছিলেন। অন্যবার নিশাযুদ্ধে অলক্ষ্যে থাকিয়া বাণবর্ষণে রামচন্দ্র ও অন্যান্য সকলকে মৃতপ্রায় করিয়াছিলেন। **জাগানু অকালে**—কুম্ভকর্ণকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অকালে জাগানো হইয়াছিল। **বরিষু**—বরণ

হয়কার। কল্পনাকুশলতা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কল্পনার বিশালতা ও ব্যাপকতা দ্বারা কাব্যের রসনিষ্পত্তি হয়। মধুসূদনও তাই কাব্য সৃষ্টিতে কল্পনার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তাই কল্পনা তাঁহার নিকট দেবীর নবরূপ লাভ করিয়াছে। মৌমাছির দল যেমন ফুলবন হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র রচনা করে। এবং সেই মধুপানে অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। মধুকবিও তেমনি আশা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে অপকল্পনার যে বিশাল ফুলবন আছে। তাহার মধু লইয়া তিনি এমন সুন্দর এক মহাকাব্য রচনা করিবেন যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বঙ্গবাসীকে অমৃত আস্বাদনের আনন্দদান করিবে। তাঁহার সেই মহাকাব্য চিরদিন বঙ্গবাসীকে অনাবিল আনন্দ দান করিবে।

৪। নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, যে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ রণে? কুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মতো বীরের মৃত্যু যে কতখানি অসম্ভব ব্যাপার, তাহাই বর্ণনা প্রসঙ্গে রাবণের খেদোক্তি এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগ্নদূত আসিয়া রাবণকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ জানাইলে রাবণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মতো মহাবীরের নিধন রাত্রিকালের স্বপ্নের মতো অসম্ভব বা অলৌকিক বলিয়া মনে হইয়াছে। রাত্রিকালে ঘুমের মধ্যে মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যেই শুধু নানা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, বা অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়। রাত্রি শেষে ঘুম ভাঙিলে সে স্বপ্নের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন বোঝা যায়, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা একান্তই অবাস্তব। তেমনি বীরবাহুর মৃত্যুও রাবণের নিকট অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ঘটনা। এই ঘটনা যে সম্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি মনে করেন না। শিমুল গাছ অতিশয় কঠিন ও শক্ত। তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারাও ইহা ছেদন করা মুস্কিল। কেহ যদি বলে, যে ফুলের পাপড়ি ছুড়িয়া শিমুল গাছ ছেদন করা হইয়াছে, তখন তাহা অসম্ভব বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কেন না ফুল ছুড়িয়া শিমুল কখনই ছেদন করা যায় না। তেমনি যে বীরবাহুর মতো মহাবীরের বীরত্বে দেবতারাও সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন, সেই বীরবাহুকে রামচন্দ্র হত্যা করিয়াছেন, ইহা যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রামচন্দ্রের কতটুকু ক্ষমতা বা শক্তি সামর্থ্য যে বীরবাহুর মতো বীরকে হত্যা করিতে পারেন।

৫। কুসুমধান সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ ঘোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিভিছে দেউটি।

রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী অজেয় সমুদ্রকে বন্ধন করিয়া তাহার উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছে। ইহার উপর দিয়া সেনাবাহিনী পারাপার করিতেছে। সমুদ্র চিরদিন অজেয় অলঙ্ঘ্য। কেহ তাহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই। সমুদ্র চির স্বাধীন। অবাধ মুক্তির মধ্যেই তাহার সৌন্দর্য। আজ রামচন্দ্রের হাতে তাহার বন্ধন দশা ঘটিয়াছে। ইহাকে মনে হইতেছে যেন বন্ধনমাল্য। সমুদ্রের অঙ্গে যেন বন্ধনের মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে একান্ত বেমানান। সমুদ্র জলের অধিপতি। তাহার রূপ অতি বিরাট। তাহাকে কখনো লঙ্ঘন করা যায় না, বা তাহাকে জয় করা যায় না। রামচন্দ্রের হাতে বন্ধনদশা গ্রহণ করায় তাহার সমস্ত মর্য্যাদা যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার গৌরব বিপর্যস্ত। সমুদ্রের এই হৃত গৌরব দেখিয়া রাবণ বিক্ষুব্ধ অন্তরে তাহার প্রতি বিদ্রূপবাক্য নিক্ষেপ করিয়াছেন।

১২। কোথা মম অমূল্য রতন ?
ধরিত্রধন রক্ষণ রাজধর্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকাতুরা মাতা চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ বাক্য এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।

রানী চিত্রাঙ্গদা রাবণের অন্যতম মহিষী। তিনি প্রধান মহিষী নহেন, এইজন্য স্বামীর সান্নিধ্যলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। পুত্র বীরবাহুকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবনধারা প্রবাহিত হইত। পুত্র ছিল তাঁহার নয়নমনি। বীরবাহু রামচন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইবার পর তাঁহার জীবন শূন্য হইয়া গিয়াছে। পুত্রহারা অবস্থায় তিনি কাঙালিনী। বীরবাহুকে তিনি রাবণের নিকট রাখিয়াছিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করাই ছিল রাবণের রাজধর্ম। কিন্তু রাবণ সে রাজধর্ম পালন করেন নাই। রাবণ যদি বীরবাহুকে রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন। তবে বীরবাহু অকালে মরিত না বা তাঁহার জীবনও এমনভাবে অন্ধকার হইয়া যাইত না। বীরবাহুকে যুদ্ধে পাঠাইবার আগে রাবণের চিত্রাঙ্গদার কথা ভাবা উচিত ছিল। এখন তিনি কি করিবেন, বুঝিতে পারিতেছেন না। পুত্রহারা অবস্থায় তাঁহার পক্ষে জীবণধারণই কষ্টকর।

১৩। এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, লঙ্কনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদার অনুযোগের উত্তরে রাবণের শোকার্তি এই অংশে প্রকাশিত হইয়াছে।

বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ মহিষী চিত্রাঙ্গদা অতিশয় শোকার্ত। পুত্র ছিল তাঁহার জীবনের অবলম্বন। সেই পুত্রবিহনে তাঁহার জীবন শূন্য হইয়া গিয়াছে। রাবণের কুকার্যের ফলেই তাঁহার পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু রাবণ

জিজ্ঞাসা করিলে সখী মুরলা রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতির বিষয় জানাইল। বারুণীর নির্দেশে সে লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিয়া লঙ্কাদেবীর নিকট উপস্থিত হইল। লঙ্কাদেবী তাহাকে বলিলেন যে রাবণের পাপের জন্য লঙ্কা বীরশূন্য হইয়া পড়িতেছে। তখন সেই সংবাদ দানের জন্য মুরলা আবার বারুণীর উদ্দেশে আকাশ পথে উড়িতে লাগিল। তাহার অপূর্ব রূপ যেন শতধারে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। মনে হইল সে যেন এক রূপসী ময়ূরী। ইন্দ্রের ধনুতে যেমন বিবিধ রত্ন খচিত থাকে বলিয়া তাহা মনোরম বর্ণাঢ্য রূপ ধারণ করে, মুরলাকে সেইরূপ বর্ণাঢ্য মনে হইতেছিল।

১৬। নিশারণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে, তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রভাষার মুখে বীরবাহুর মৃত্যুর কথা শুনিয়া মেঘনাদের বিস্ময়-সূচক উক্তি এখানে প্রকাশিত।

বীরবাহু মহাবীর। তাই প্রভাষার মুখে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মেঘনাদ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি নিজে নিশাযুদ্ধে রামচন্দ্রকে বধ করিয়াছেন। প্রচণ্ড তীর বর্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দুর্মোচ্য নাগপাশে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং রামচন্দ্রের পক্ষে জীবন লাভ করিয়া বীরবাহুকে বধ করা অবিশ্বাস্য ঘটনা। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যে লোক মরিয়া যায়, তাহার পক্ষে পুনরায় জীবন লাভ করা সম্ভব না। সুতরাং প্রভাষার কথা বিশ্বাস্য নয়। তাই মেঘনাদ তাহাকে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি কোথায় এই অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়াছেন, তাহা যেন শীঘ্র প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় সর্গ

শব্দার্থ টীকা-টিপ্পনী

আইলা.......... ভালে—গোধূলিবেলায় পশ্চিম আকাশে শুকতারা দেখা যায়। এই শুকতারাকে কবি গোধূলির ললাটের রত্ন কল্পনা করিয়াছেন। **কুমুদী**—শাপলাফুল। **মুদিলা**—বন্ধ করিল। **মুদিলা.....সরসে.....নলিনী**—সূর্য অস্ত গেলে তাহার প্রিয়তমা পদ্মের চোখ অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং তাহার মুখ হইল বিষণ্ণ। **কুজনি**—কূজন করে। **কুলায়ে**—নীড়ে। **গোষ্ঠগৃহে**—

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

(১) ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর আদি
দেবীর চরণাশ্রয়ে বিশ্রাম লভিলা।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখানে কবি দিবা অবসানের অব্যবহিত পরমুহূর্তের রাত্রি সমাগমের মনোরম বিবরণ দান করিয়াছেন।

দিবাভাগে জীবকুল নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। কাজের মধ্যে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। দিনের শেষে আসে রাত্রি। এবার সকলেই ক্লান্ত দেহে নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরিয়া যায়। নিদ্রাদেবীর স্নেহময় ক্রোড় জীবকুলের পরম আশ্রয়। নিবিড় অন্ধকারে যখন স্বর্গ-মর্ত্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন জীবকুল নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করে। শিশুরা যেমন খেলাধূলার শেষে মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করে, পক্ষিকুল নিজ নিজ নীড়ে বিশ্রাম লয়, জীবকুলও নিদ্রাদেবীর স্নেহচ্ছায়ায় বিশ্রাম লয়। তাহাদের সকল শ্রান্তি ক্লান্তির অবসান ঘটে।

(২) বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মেঘনাদ বধের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিবার জন্য লক্ষ্মীদেবীর ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি এখানে বিবৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মীদেবী রাবণের আশ্রয়ে আর বাস করিতে চান না। কেননা তিনি রাবণকে পাপী মনে করেন। তাঁহার পাপের জন্য তাঁহার ধ্বংস অনিবার্য। রাবণের মৃত্যু হইলে তিনি এখান হইতে মুক্তি পাইবেন। এখন রাবণকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবার সাধ্য তাঁহার নাই। কারাগারে যে বন্দী আবদ্ধ থাকে, সে নিজের চেষ্টায় বাইরে যাইতে পারে না। কারাগারের দ্বার খুলিলে তবেই সে মুক্তি পায়। তেমনি লক্ষ্মীদেবীও নিজের চেষ্টায় বা ইচ্ছায় লঙ্কাপুরীরূপ এই কারাগারের বাইরে যাইতে পারিবেন না। যতক্ষণ না ইন্দ্রাদি দেবতাগণ রাবণকে হত্যার ব্যবস্থা না করেন। ততক্ষণ লঙ্কাপুরীর কারাগার হইতে তাঁহার মুক্তি নাই। রাবণের মৃত্যু হইলেই লঙ্কাপুরীর দ্বার খুলিয়া যাইবে। অতএব ইন্দ্র যেন রাবণ বধের নিমিত্ত তৎপর হইয়া ইহার নিমিত্ত উদ্যোগ আয়োজন করেন।

(৩) পরিমল সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার। মৃণালের রুচি
বিকচ কমলগুণে; শুন গো ললনে।

রাবণ হর-পার্বতীর অনুগত ভক্ত, তাহাদের আশ্রিত। সুতরাং কিরূপে পার্বতী আশ্রিত ভক্তের বধের পরামর্শ দিবেন। রাবণকে ধ্বংস করিতে পারেন একমাত্র শিব। কিন্তু ইন্দ্রের পক্ষে শিবের নিকট গমন ও রাবণ বধে রাজী করানো অসম্ভব। একমাত্র পার্বতীর পক্ষেই ইহা সম্ভব। তাই ইন্দ্র পার্বতীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবনের সকলে ভীত সন্ত্রস্ত। ধর্মের মহিমা লুপ্ত হইয়া চারিদিকে অধর্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবী পাপের ভারে পীড়িত। তাই বাসুকী যেন আর পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না। তাই ইন্দ্রের প্রার্থনা: দেবী রাবণ বধ করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করুন, ধর্মের মহিমা বৃদ্ধি হোক, পৃথিবীকে তিনি পাপের ভার হইতে যেন মুক্ত করেন। রাবণের মৃত্যুর মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরিয়া আসুক।

(৮) তথায় উমার ইচ্ছা পরিমল ময়—
বায়ু তরঙ্গিনী রূপে, বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে!

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। পার্বতী রতিদেবীকে স্মরণ করিলে কিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই এখানে বিবৃত হইয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র শচীদেবীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস পর্বতে যাইয়া পার্বতীর কাছে মেঘনাদ বধের নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এদিকে রামচন্দ্রও অকালে দেবীর বোধন করিয়াছেন। পার্বতী মহাদেবের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কন্দর্পদেব এবং তাহার পত্নী রতিদেবীর সাহায্যে যোগমগ্ন শিবকে কামোন্মত্ত করিয়া দিতে হইবে, এবং ইহার পর কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। তিনি রতিদেবীকে স্মরণ করিলেন। রতিদেবী তখন কুসুমবনে কন্দর্পদেবের সহিত বিহার করিতেছিলেন। সেই সময় দেবীর মনোবাসনা তাঁহার নিকট বায়ু-স্রোতের মতো উপস্থিত হইল। রতির হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে দেবী প্রেমের প্রয়োজনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। অঙ্গুলির স্পর্শে যেমন বীণার তারে অপূর্ব সুর ঝংকৃত হইয়া ওঠে, পার্বতীর ইচ্ছার স্পর্শে রতীদেবীর হৃদয় তেমনি পুলকিত হইয়া উঠিল।

(৯) যে অগ্নি কুসুমে তোমা পাইয়া যতনে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিস্তার কৌশলে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পার্বতী কন্দর্পদেবকে অভয় দান করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে বিবৃত হইয়াছে।

বিস্মিত হইলেন। তখন পার্বতী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে পতিব্রতা নারী কখনই সখীর সহিত স্বামীর নিকট আসেন না। স্বামী সান্নিধ্য পতিব্রতা নারীর নিকট অত্যন্ত পবিত্র। সখী লইয়া আসিলে পতি সান্নিধ্যের পবিত্রতা ও মাধুর্য সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। তাই তিনি কোন সখী না লইয়াই এই দুর্গম স্থানে আসিয়াছেন। চক্রবাক দম্পতি রাত্রিকালে পৃথক থাকিয়া বিরহে রাত কাটায়। প্রভাতে চক্রবাকী একাকিনী তাঁহার প্রিয়জনের কাছে যায়। সেইরূপ পার্বতীও স্বামী সান্নিধ্যের জন্যই তাঁহার নিকট একাকিনী আসিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

(১২) শুকাইল অশ্রুবিন্দু যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয় শিখরে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। কন্দর্পদেবের আগমনে রতিদেবীর চিত্তে যে প্রশান্তি আসিয়াছে, তাহাই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।

যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পার্বতী মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। কন্দর্পদেব নিকটে দাঁড়াইয়া পুষ্পধনু হইতে মদন বাণ নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। তাঁহার পত্নী রতিদেবী হস্তীদন্ত নির্মিত প্রাসাদে একাকিনী দণ্ডায়মান। পতির বিরহে তিনি কাতর। তাঁহার হৃদয় আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ। একবার শিবের ধ্যান ভাঙাইতে যাইয়া তাঁহার যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখ অশ্রুপূর্ণ। এই সময় কন্দর্পদেব সেখানে আসিয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। পতির সান্নিধ্যে রতির বিরহ-বেদনা দূর হইল, তাহার চোখের জলধারা শুকাইয়া গেল। সূর্যের উদয়ে পদ্মদলের উপরস্থিত শিশিরবিন্দু যেমন শুকাইয়া যায়, কন্দর্পদেবের আবির্ভাবে রতিদেবীর চোখের অশ্রু সেইরূপে শুকাইয়া গেল।

(১৩) দেবপ্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন,
ইন্দ্রিয় দমন, ধর্মপথে সদা গতি ;
নিত্য সত্য দেবীসেবায় চন্দন কুসুম
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র, আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। চিত্ররথ রামচন্দ্রের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে বিবৃত হইয়াছে।

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ লক্ষণের জন্য দৈবদত্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছেন রামচন্দ্রের নিকট। দেবতাদের অনুগ্রহে রামচন্দ্র অভিভূত। কিভাবে তিনি দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। তখন চিত্ররথ বলিয়াছেন যে দরিদ্রের রক্ষণ, ইন্দ্রিয় দমন, ধর্মপথে জীবন যাপন—এইগুলি দেবতাদের কাম্য। দেবতার পূজায় সাধারণত চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র, ভোজ্যাদি ও

কাব্যিক বিশালতা ও পরিকল্পনার জন্য দ্বিতীয় সর্গের গুরুত্ব ও সার্থকতা অনুধাবন করা যায়।

প্রশ্ন ৩। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাজসভায় রাবণের ব্যক্তিত্ব কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা লিখ।

উত্তর। লঙ্কেশ্বর রাবণ মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রধান চরিত্র। রাবণপুত্র মেঘনাদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও তজ্জনিত রাবণ মানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যদিও আলোচ্য কাব্যের মূল উপজীব্য, তথাপি রাবণই এই কাব্যের আদ্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছেন। রাবণ মধুসূদনের কবি প্রতিভার অসামান্য সৃষ্টিকর্ম। বাল্মীকি রামায়ণের রাবণ চরিত্র হইতে মধুসূদন মূল উপাদান গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে সাজাইয়াছেন আপন মানস কল্পনার বর্ণাঢ্য বৈভবে। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ দুর্ধর্ষ মহাপরাক্রমশালী দুরাচারী রাক্ষসরাজ। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল এক গৌরবদীপ্ত চরিত্র। তাই বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

The idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow.

মধুসূদনের রাবণ উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের মূর্ত প্রতীক। তিনি বলিষ্ঠ মানবতাবাদ ও পুরুষকারের উজ্জ্বল বিগ্রহ। কবি একদিকে য়ুরোপীয় আদর্শ অন্যদিকে রেনেসাঁসের আদর্শের সংমিশ্রণে এই চরিত্রটির পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় "রাবণের চরিত্র সৃষ্টিতে একত্র দুইটি ভিন্ন উপাদানের সদ্ভাব ঘটিয়াছে। একদিকে য়ুরোপীয় পুরুষকারের আদর্শ—প্রকৃতির সহিত সংগ্রামশীলতা, সর্ববিধ নিয়তির উপর ভ্রূক্ষেপহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা; অপরদিকে মানবতার আর এক আকুতি কবিকে তেমনই মুগ্ধ করিয়াছে।"

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণ নানাবিধ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। লঙ্কাপুরীর আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণাঢ্য রাজসভায় রাজকীয় মহিমায় রাবণ স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন—

কনক আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ।

রাজসভায় অতুল বৈভবের মধ্যে লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজকীয় গাম্ভীর্যে ও মহিমায় পরিপূর্ণ। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে তাঁহার হৃদয় শোকাচ্ছন্ন। তিনি রাজাধিরাজ। উচ্চস্বরে বিলাপ তাঁহার পক্ষে অশোভন। অন্তর্দহনের ক্রন্দন তাঁহার চোখে অশ্রুধারা আনিয়া দিয়াছে—

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা

প্রথম সর্গে রাবণের মধ্যে একদিকে রাজকীয় মহিমা ও পুত্রস্নেহাতুর-হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়াছে। তিনি একাধারে সম্রাট, ও অন্যধারে স্নেহময়

ভয় করেন না। আপন শক্তি-সামর্থ্য-পরাক্রমে তাঁহার গভীর আস্থা। তাই তিনি অনায়াসে বলেন—

সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শমানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে;

মেঘনাদ শক্তিমান, তাঁহার এই শক্তির উৎস তাঁহার শ্রদ্ধা। রাবণকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করেন। তাই রাবণ যখন স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার কথা বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিয়াছেন যে তিনি জীবিত থাকিতে রাবণের যুদ্ধযাত্রা শোভা পায় না। রাবণ মহাবীর—

থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।

সুতরাং মেঘনাদ যুদ্ধে যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর। রামচন্দ্রের পরাজয় ও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন দ্বিধা নাই, সন্দেহ নাই। তিনি দুর্বার, নির্ভীক। মৃত্যুভয় তাঁহার নিকট তুচ্ছ। রামচন্দ্রকে তিনি ইতিপূর্বে দুইবার হত্যা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার তৃতীয় মৃত্যু সম্পর্কে তিনি সন্দেহহীন। ইহার পর রাবণ তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষেক করিয়াছেন।

মেঘনাদ মধুসূদনের মানস সন্তান; তাঁহার মানস কল্পনার আদর্শ রূপ। তাই মেঘনাদকে তিনি অসামান্য বীর এবং অসাধারণ হৃদয়বোধ সম্পন্ন পুরুষ হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চরিত্রটির মধ্যে কোন মলিনতা নাই। কোন আবিলতা নাই। প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় "এ চরিত্র নিদাঘ দিবার মতো দীপ্ত ও নির্মল, কোনখানে মেঘ বা কুয়াশার লেশমাত্র নাই। ইহার অন্তঃকরণে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রশ্ন সংশয় নাই। বৈরাগ্য নাই; প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট কুসুমে কোথাও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই। আর্য রামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল মধুসূদনের মেঘনাদে অন্য যান মহৎ গুণের সমবায়ে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে—মায়ের দুলাল, পিতার নয়নমণি, পত্নীর কণ্ঠহার, শত্রুর দুঃস্বপ্ন এই মেঘনাদে মলিন অগ্নি মরুতের পরিপাতে মেদুর মেঘকান্তির মতো নয়নমনোহর হইয়াছে।"

প্রশ্ন ৫। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনের মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের যে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আলোচনা কর। এই চরিত্রের অবতারণার সার্থকতা কি লিখ।

উত্তর। মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রাঙ্গদা চরিত্র স্বল্পকালীন অবস্থানের মধ্যেও পাঠকচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। এই চরিত্রটি মধুসূদনের মৌলিক সৃজনক্ষমতার স্বাক্ষর। বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রাঙ্গদা বলিয়া রাবণের কোন মহিষীর উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে শুধুমাত্র তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদন কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে চিত্রাঙ্গদা নামটি গ্রহণ করিয়া আপন কবিকল্পনায় তাঁহাকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

রাবণের অসংখ্য মহিষীর মধ্যে চিত্রাঙ্গদা একজন। রাবণের নিকট তাঁহার স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা বা গুরুত্ব নাই। তিনি একমাত্র পুত্র বীরবাহুকে লইয়া মিলিতে বাস করিতেন। বীরবাহু তাঁহার নয়নমণি। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার উপেক্ষিত নারীজীবন সান্ত্বনা লাভ করিত। সেই নয়নমণি বীরবাহুর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের অবলম্বন যেন হারাইয়া গিয়াছে। তিনি শোকার্ত হৃদয়ে রাবণের রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বলিয়াছেন—

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; বীর আমি খুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষকুল মান··
কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?

রাবণ তাঁকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিয়াছেন যে, বীরবাহু দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছে। তাঁহার এ মৃত্যু গৌরবের মৃত্যু। চিত্রাঙ্গদা বীরমাতা। তাঁহার পক্ষে ক্রন্দন শোভা পায় না—

বীরকর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে।

চিত্রাঙ্গদা কিন্তু রাবণের এই কথা স্বীকার করেন না। দেশের জন্য যে পুত্র যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেয়, তাঁহার জন্ম শুভক্ষণে। তাঁহার মাতা ভাগ্যবতী। কিন্তু এক্ষেত্রে রাবণের এ যুক্তি অচল। রামচন্দ্র লঙ্কাপুরী অধিকারের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন নাই। রাবণ যেহেতু তাঁহার পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। তাই তাঁহাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়াছেন। লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্যের লোভে তিনি এত কষ্ট করিয়া এতদূরে আসেন নাই—

কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে
কোন লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে
রাঘব?

চিত্রাঙ্গদার দৃষ্টিতে রামচন্দ্র নির্দোষ। পত্নীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি সঙ্গত কার্যই করিতেছেন। লঙ্কাপুরীর প্রতি যেহেতু তাঁহার কোন লোভ নাই। তাই তাঁহাকে দেশের শত্রুও বলা যায় না—

তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি?

পুত্রকে হারাইয়া চিত্রাঙ্গদা যেন প্রকৃত সত্য দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে রাবণের কুকর্মের জন্যই লঙ্কাপুরীর এই বিপর্যয়। তাঁহার পাপের জন্যই তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যু হইয়াছে। রাবণ রামচন্দ্রকে অন্যায়কারী অপরাধী বলিয়াছেন। কিন্তু রাবণই প্রকৃত অন্যায়কারী। রামচন্দ্র শান্তিপ্রিয় স্বভাবসন্ন্যাসী। কিন্তু রাবণের নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাকে দুর্ধর্ষ

তাহাকে ততটা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, যতটা করিয়াছিল সেই মনোভাব প্রসূত উদাত্ত গভীর ছন্দধ্বনি। দান্তে বা ট্যাসোর মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান আদর্শও তাঁহার কল্পনার অনুকূল ছিল না, তাই তাঁহার কাব্যে দান্তের নরক বর্ণনার অনুকরণ নিতান্তই প্রাণহীন হইয়াছে। কিন্তু গ্রীক কবির সহজ সৌন্দর্যপ্রীতি, সরল তত্ত্ব-চিন্তাহীন মানবতার আদর্শ তাঁহার কবিচিত্ত জয় করিয়াছিল।"

মেঘনাদ-বধ কাব্যে হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসী' কাব্যের ভাবাদর্শ সমধিক পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় সর্গে মেঘনাদের বিরুদ্ধে স্বর্গলোকে দেবতাদের ষড়যন্ত্র, পার্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া শিবের নিকট গমন, শিব-পার্বতীর মিলন, অস্ত্রদান প্রভৃতি বিবরণ গ্রীক কবির নিকট হইতেই গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গ ছাড়া অন্যান্য সর্গেও হোমারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মধুকবি একটি পত্রে লিখিয়াছেন "As a reader of the Heroic epics, you will, no doubt be reminded of the fourteenth Illiad, and I am not ashamed to say, that I have, intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida."

মেঘনাদ বধের চরিত্র সৃষ্টিতেও হোমারের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দেবদেবীরা প্রায়শ শান্ত ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণকামী। হোমার অঙ্কিত দেবদেবীরা উগ্র হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ ও জীবনভোগী। মেঘনাদ বধ কাব্যের দেবদেবী চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন হোমারের এই দেবদেবীদের বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার শিব জেউসের আদর্শে রচিত। এবং উমার পশ্চাতে রহিয়াছে হেরার প্রভাব। মহামায়া হোমারের আথেনার অনুরূপ। মেঘনাদের পরিণাম হেক্টরের পরিণামের অনুরূপ। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণের আচরণ প্যাট্রক্লোসের মৃত্যুতে আথিলেওসের অনুরূপ। প্রমীলা চরিত্রটি হেক্টরের স্ত্রী আন্দ্রোমাকের আদর্শে রচিত।

মেঘনাদ বধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দ নির্মাণে পাশ্চাত্য আদর্শ বহুল পরিমাণে অনুসৃত। মেঘনাদ বধ কাব্যে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা যে মিলটনের Blank Verse ছন্দের আদর্শে রচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মেঘনাদ বধ কাব্যকে বিবিধ ঐশ্বর্যে ও ভাবে সাজাইবার জন্য মধুসূদন পাশ্চাত্যের অনেক কবির নিকট হইতেই অলংকার গ্রহণ করিয়াছেন। কখনো তিনি নিজস্ব কবি প্রতিভায় এ অলংকার এমনভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন যে কাব্যশরীরের সহিত তাহা একাকার হইয়া গিয়াছে। আবার কখনো যথার্থ কল্পনার অভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। তবে সামগ্রিকভাবে হোমারের সহিত তাঁহার মানসলোকের সাধর্ম্য থাকায় তিনি হোমারকেই বেশী করিয়া অনুসরণ করিয়াছেন। প্রখ্যাত সমালোচক তাই যথার্থই বলিয়াছেন "কাব্য নির্মাণ কৌশলে, রসাত্মক কাব্যযোজনা, বিচিত্র কল্পনাবস্তু প্রভৃতির জন্য তিনি ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো ও মিলটন হইতে বায়রণ, মুর, পর্যন্ত এবং বাল্মীকি, কালিদাস হইতে কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস পর্যন্ত সকলেরই দ্বারস্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজস্ব কল্পনা ও কাব্য-প্রকৃতি হোমারকে যেভাবে অনুসরণ করিয়াছিল, এমন আর কাহাকেও নহে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি হোমারকে ভুলিতে পারেন নাই—বাংলা

করিয়াছেন। মধুসূদন নিজেও এই কাব্যকে মহাকাব্য হিসাবেই রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাতেই ধরা পড়ে—

গাইব মা, বীররসে, ভাসি
মহাগীত।

মহাকাব্য রচনার মানসপ্রস্তুতিও যে তাঁহার ছিল, তাহা তাঁহার লেখা বিভিন্ন পত্র হইতে বুঝা যায়। কিন্তু সে যুগের বিচারে মেঘনাদ বধ মহাকাব্য হিসাবে চিহ্নিত হইলেও এ যুগের বিচারে তাহার কিরূপ মূল্যায়ণ হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী বিচার করিলে দেখা যায় যে মেঘনাদ বধের মধ্যে মহাকাব্যের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের যথার্থ অভাব আছে। ইহার নায়ক সদ্বংশজাত বা ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত নহে। নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাব্যের উপসংহার ঘটে নাই। মহাকাব্যে যে বিশালতা, বিস্তৃতি, ঔদার্য ও সার্বজনীনতা থাকে, মেঘনাদ বধে তাহারও যথেষ্ট অভাব। মহাকাব্যে কবি থাকেন নিরপেক্ষ, তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার কোন পরিচয়ই থাকে না। কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়া কবির ব্যক্তিমানস বারবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভারতীয় রীতি অনুযায়ী মেঘনাদ বধ কাব্যকে মহাকাব্য না বলা গেলেও পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী ইহাকে Literary Epic হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। Literary Epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্যের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা ইহার মধ্যে বর্তমান। ইহার ভাব পরিকল্পনার মধ্যে একদিকে আছে পাশ্চাত্য মহাকাব্যোচিত বিস্তার; অন্যদিকে বহিরঙ্গ গঠন পরিকল্পনার মধ্যেও আছে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের শিল্প সুষমা। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের মধ্যে যেমন দেখা যায়, মধুসূদনের কাব্যের 'চরিত্রগুলির মধ্যেও তেমনি নাটকীয় গুণ বিকাশলাভ করিয়া মধ্যে মধ্যে চমৎকারিত্ব ও বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ঘটনার একমুখীনতাও ইহার একটি বিশিষ্ট পাশ্চাত্য মহাকাব্যোচিত গুণ, কাহিনীর বস্তুধর্মিতাও ইহার পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ধর্ম রক্ষা করিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্র ধ্বনি-প্রবাহ, কাব্য দেহের সমৃদ্ধি, অলংকার কল্পনার বিশালতা এবং বৈচিত্র্য ইহাকে পাশ্চাত্য মহাকাব্যেরই অনেকটা সমধর্মী করিয়াছে।'

তবে বহিরঙ্গ আকৃতিতে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অনুরূপ হইলেও অন্তর প্রকৃতিতে ইহা গীতিকাব্য সুর সমৃদ্ধ। মহাকাব্য রচনার প্রস্তুতি ও আয়োজনের অভাব ছিল না। কিন্তু কবির নিজের রুচি ও আত্মভাবের প্রাধান্য, দুর্বল মানব প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি, বিরাট ও বৃহতের প্রতি পক্ষপাত, এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ এই কাব্যকে বাঙালী জীবনের গীতিকাব্যে পরিণত করিয়াছে।

প্রশ্ন ১২। মেঘনাদ বধ কাব্যের দেবদেবীর চরিত্র অঙ্কনে মধুসূদনের মনোভাবের যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ অবলম্বনে তাহা আলোচনা কর।

উত্তর। মধুসূদন ছিলেন উদারপন্থী। দেবদেবী চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন অহেতুক গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতা ছিল না। হিন্দু দেবদেবীদের

যে তাঁহাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আবহ রীতিতে হইবে, এ ধরণের মনোভাব তাঁহার ছিল না। তাই তিনি নিজস্ব কবিতাবলীর প্রয়োজন অনুযায়ী হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গে পাশ্চাত্য বেশভূষা পরাইয়া দিয়াছেন। এ সম্পর্কে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own.

মেঘনাদ বধ কাব্যে দেবদেবীর সংখ্যা কম নহে। পাশ্চাত্য মহাকাব্যে যেমন দেবদেবীরা বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মূল কাহিনীকে পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন, মেঘনাদ বধ কাব্যেও দেবদেবীরা প্রধান কাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল দেবদেবী পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার পত্নী শচীদেবী, মহাদেব, উমা, কমলা, বারুণী, মায়াদেবী, কার্তিক, কন্দর্প, রতিদেবী, চণ্ডী, বীরভদ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই রাবণের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং তাই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত। ইহাদের নেতা দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্র যেহেতু মেঘনাদ কর্তৃক নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত তাই তিনি মেঘনাদের হত্যা বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর। দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ আলোচ্য কাব্যে এত দ্রুত যে মনে হয় তাহারাই বুঝি এখানে প্রধান ভূমিকা লইয়াছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে বারুণী ও মুরলার কথোপকথনের মাধ্যমে দেবীদেবীদের ভূমিকার সূচনা করা হইয়াছে। রাবণ মহিষী চিত্রাঙ্গদা রাবণের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়া প্রস্থান করিলে রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভৈরব গর্জন শুনিয়া রাক্ষস সেনাদল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইল। চারিদিকে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। সেনাবাহিনীর পদভরে লঙ্কাপুরী টলমল করিতে লাগিল। সাগর পত্নী বারুণী জলতলে মুক্তাফল দিয়া কবরী বাঁধিতেছিলেন। লঙ্কাপুরীর কোলাহলে চমকিত হইয়া সখী মুরলাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুরলা বলিলেন—

এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
নাশিতে, রাঘবের বীরগর্ব রণে।

তখন বারুণী তাহাকে সখী রাজলক্ষ্মী কমলার নিকট পাঠাইল। কারণ "শুনিতে বাসনা মোর রণের বারতা।" মুরলা কমলার কাছে গেলে কমলা তাঁহাকে রাবণের যুদ্ধসজ্জা দেখাইতে লইয়া গেলেন। মেঘনাদ এখনও বীরবাহুর নিধন সংবাদ জানেন না। কমলা তাঁহাকে সেই সংবাদ জানাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেবদেবীদের ক্রিয়াকলাপ লইয়াই রচিত। ইন্দ্র এখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া পত্নী শচীদেবী সহ কৈলাসে উমার নিকট যাইয়া মেঘনাদ বধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। উমা কন্দর্পদেবকে সঙ্গে করিয়া যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন শিবের কাছে যাইয়া তাঁহার ধ্যান

উপমা ছাড়া অন্যান্য অলংকার প্রয়োগেও মধুসূদন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ব্যবহৃত অন্যান্য কয়েকটি উপমার নির্দশন দেওয়া হইল—

(১) অনুপ্রাস—

সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা।

(২) নামরূপক—

শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
ঘনাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিঃশ্বাস প্রলয়বায়ু ; অশ্রুবারি ধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।

(৩) উৎপ্রেক্ষা—

ধরে ছত্র ছত্রধর, আহা
হয় কোপানলে কাম যেন যে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে।

(৪) অতিশয়োক্তি—

হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূট তরা
এ ভূজগে ?

(৫) স্বভাবোক্তি—

কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, অধিকন্তু স্নেহ তার প্রতি
সমধিক।

(৬) ব্যাজস্তুতি—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের অলংকার প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় ছড়াইয়া আছে। কাব্যশরীরের সৌন্দর্য বিধানের জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাই কাব্যকে সুন্দর করিবার মানসে সকল কিছুই তিনি অলংকার হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন ১৯। মেঘনাদ বধ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের কবি প্রতিভার এক অভিনব সৃষ্টি। এই সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি নিজের কবিত্বের সার্থক কাব্যরূপদানে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আরো প্রিয় হইয়া যায়। সৃষ্টির বাতাস মানুষের হৃদয়কে অপূর্ব পুলকাবেশে ভরিয়া তোলে। মৃণালের নিজস্ব কোন শোভা বা সৌন্দর্য নাই। পদ্মের সৌন্দর্যেই তাহার সৌন্দর্য। পদ্মফুল অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত থাকে বলিয়াই মৃণালের আদর। পদ্মফুল যদি তাহার শতদল না মেলিয়া রাখিত, যদি জলের উপর শুধুমাত্র একটি মৃণাল ভাসিয়া থাকিত তবে তাহাকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখাইত।

হরপার্বতী ইন্দ্রকে স্নেহ করেন। ইন্দ্রকে দেখিলে তাঁহারা আনন্দলাভ করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রের সহিত যদি শচীদেবীকে দেখেন, তবে তাহারা দ্বিগুণ আনন্দলাভ করিবেন। শচীদেবীর জন্য তাঁহার আদর আরও বাড়িয়া যাইবে।

হরপার্বতীর নিকট গমন প্রসঙ্গে ইন্দ্র শচীকে এইসব কথা বলিয়াছেন।

প্রশ্ন ২২। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গ অবলম্বনে রাবণ চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

(কঃ বিঃ ১৯৮১)

উত্তর। 'রাবণ চরিত্র' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২৩। মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে দেবদেবীর পরিকল্পনায় মধুসূদনের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা করে এই সর্গে মধুসূদনের কোন মৌলিকতা আছে কি না দেখাও।

(কঃ বিঃ ১৯৮১)

উত্তর। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ একান্তভাবে দেবদেবীর লীলা-নির্ভর। এই সর্গে প্রধানত দেবদেবীদের ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দেবসভায় বসিয়াছিলেন। সম্মুখে উর্বশী, রম্ভা, চিত্রলেখা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরা নৃত্যরত। এই সময় রাবণের রাজলক্ষ্মী কমলা সেখানে প্রবেশ করিয়া মেঘনাদের অভিষেকের কথা বলিলেন। মেঘনাদ এখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছেন। পূজার শেষে তিনি যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, তখন রামচন্দ্রকে রক্ষা করা কঠিন হইবে। ইন্দ্র বলিলেন যে এই বিপদে মহাদেবই একমাত্র ভরসা।

ইন্দ্র পত্নী শচীদেবীকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। সেখানে স্বর্ণাসনে মহেশ্বরী উমা বসিয়া আছেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকট রামচন্দ্রের বিপদ-বার্তা নিবেদন করিলেন

উমা বলিলেন যে মহাদেব এখন যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন। তিনি রাবণকে স্নেহ করেন। স্বামী যাঁহাকে স্নেহ করেন, তিনি কিরূপে তাঁহার অনিষ্ট কামনা করিবেন।

ইন্দ্র বলিলেন যে রাবণ দেবদ্রোহী। তিনি রামচন্দ্রের পত্নীকে হরণ করিয়াছেন। উমা বলিলেন যে রাবণ মহাদেবের আশ্রিত। মহাদেব ছাড়া অন্য কেহ তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র তখন উমাকে যোগাসন পর্বতে উমাকে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ঠিক এই সময় রামচন্দ্র অকালপুরীতে দুর্গা পূজায় বসিয়াছিলেন। উমার হৃদয় তাহাতে করুণার্দ্র হইল। তিনি যোগাসন পর্বতে যাইতে সম্মত হইলেন।

সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোনার তরী : কাব্য পরিচয় : 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথের যৌবন-কালের কাব্যগ্রন্থ। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস হইতে ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে এই কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে এই কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী দেখাশুনার কাজে শিলাইদহে বাস করিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি পদ্মাতীরে বোটে বাস করিতেন। এই সময়ই উন্মুক্ত গ্রামজীবন ও প্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় ঘটে। বাংলার খরস্রোতা নদী, বনজঙ্গল, খালবিল, সাধারণ মানুষের সহিত নিবিড় সংযোগ তাঁহার চেতনায় গভীর পরিবর্তন আনিয়াছিল। তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন "বাঙলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয় অপরিচয় মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাঙলা দেশকে তো বলতে পারিনে অজানা দেশ ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্তরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে।"

কাব্যবৈশিষ্ট্য : 'সোনার তরী' রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্ট ফলশ্রুতি। শিলাইদহ বাসকালে কবি জগৎ ও জীবনের রূপ রস গন্ধ বর্ণ উপভোগে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য তাঁহার মানসলোকে যে বিচিত্র ভাবচেতনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে 'সোনার তরী'র কবিতাগুলির মধ্যে। কবি প্রকৃতির রূপ রস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য তাঁহার হৃদয়ের নিভৃতলোকে যে অনুভূতির উন্মেষ ঘটাইয়াছে, স্বকীয় উপলব্ধির আলোকে তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

'সোনার তরী'র কবিতাগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মানবপ্রেম এবং মর্ত্যপ্রেম বিষয়ক কবিতা। (২) বিশ্বজীবনের সহিত ঐক্যানুভূতিমূলক কবিতা। (৩) সৌন্দর্যচেতনাপূর্ণ কবিতা। (৪) উদ্দেশ্যপূর্ণ রূপকধর্মী কবিতা (৫) বিচিত্র বিষয়ক কবিতা।

মানবপ্রেম এবং মর্ত্যপ্রেম বিষয়ক কবিতাবলীর মধ্যে মানবের প্রতি গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধা, প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতার বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা, যেতে নাহি দিব, অক্ষয়া, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ, মুক্তি, মায়াবাদ প্রভৃতি কবিতাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কবি একাকী কূলে বসিয়া আছেন। প্রচুর পরিমাণে ধান কাটা হইয়াছে। বর্ষায় নদীর দুই কূল ভাসিয়া গিয়াছে। নদী খরস্রোতা। খণ্ডাকৃতি ক্ষেত্রের চারিধারে জল বক্ররেখায় খেলা করিতেছে।

নদীর অপরপারের গ্রাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। নির্জন নদীকূলে কবি একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসিয়া আছেন। এই সময় কে যেন তরী বাহিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মুখে তাহার গান। কবি তাহাকে ভালো করিয়া চেনেন না। তরী পালে কোন দিকে না তাকাইয়া প্রচণ্ডবেগে সেই তরীখানি ছুটিয়া আসিতেছে। কবির আহ্বানে তরীখানি তীরে আসিয়া লাগে। তরীর মাঝি কবির সোনার ধানের রাশি তরীতে তুলিয়া লয়। কবি যখন সেই তরীতে স্থান লইতে চাহিলেন, তখন মাঝি জানাইয়া দিল "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী।"

মাঝি সোনার ধান লইয়া তরী বাহিয়া চলিয়া গেল। কবি একাকী নদী-তীরে পড়িয়া রহিলেন। তাহার সঙ্গী থাকিল শ্রাবণের মেঘ। তাহার যে সম্বল ছিল, তাহা লইয়া গেল সোনার তরী। "যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।" আলোচ্য কবিতায় কোন এক বর্ষণমুখর দিনে ধানের রাশি লইয়া কবির বসিয়া থাকা এবং আগন্তুক তরীর প্রত্যাশা করার চিত্রটি খুব স্পষ্ট এবং বাস্তবানুগ। ধানের মরশুমে ধান কাটিবার পর ধানের আঁটি লইয়া নদীর পারে নৌকার প্রত্যাশায় কৃষকের বসিয়া থাকিবার দৃশ্য গ্রামাঞ্চলে অতি সাধারণ পরিচিত দৃশ্য। দূর হইতে যখন কোন তরী ধীরে ধীরে তীরের নিকটবর্তী হয়, তখন কৃষকের মন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। কেন না সে ওই তরীতে ধান পাঠাইতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে নিজেও যাইতে পারে।

কিন্তু আলোচ্য কবিতায় কোন সাধারণ তরীর কথা বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে 'সোনার তরী'র কথা। এই 'সোনার তরী' একান্তভাবেই রূপকাশ্রিত। সোনার তরী বলিতে কবি মানুষের কর্মকীর্তিকে বুঝাইয়াছেন। ধানের রাশি লইয়া নদীর পারে বসিয়া থাকা কৃষক হইতেছে সংসারে কর্মরত সাধারণ মানুষ। সোনার তরীর মাঝি হইতেছে মহাকাল, সোনার ধান সৎকর্ম, ক্ষেত্র হইতেছে মানব জীবন ও সংসার। এই রূপকাশ্রিত কবিতার মধ্য দিয়া কবি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে মানুষ সংসারে বাস করিয়া নানা ধরণের কাজের মধ্যে দিন কাটায়। এই সংসারের যে শেষ কোথায়, তাহা সে জানে না। কৃষক যেমন মাঠের মধ্যে ধান কাটিয়া যায়, মানুষও তেমনি সংসারে কাজ করিয়া যায়। কৃষক যেমন তরীর প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে, মানুষও তেমনি সংসারকে তাহার কর্মরাশি এবং সেই সঙ্গে নিজেকে দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। সংসার তাহার কর্ম-রাশি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করে না। অন্ধকার মৃত্যুর মধ্যে মানুষের জীবনে সমাপ্তি নামিয়া আসে। কবি নিজেও এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকে চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে

জীবনটি ভোগ করা গেল, অংশটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাত দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনমতেই জমাবার জিনিস নয়।" সুতরাং আলোচ্য কবিতায় মানুষের কর্মকীর্তি সুন্দর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সোনার তরী নামকরণ সার্থক ও যথার্থ হইয়াছে।

প্রশ্ন ৪। 'সোনার তরী' কবিতার মর্মার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। 'সোনার তরী' কবিতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন কালপ্রবাহে মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন। মানুষ তাহার কর্মের মধ্য দিয়া সংসারকে মূল্যবান সম্পদ দান করিতেছে। এই দানের সঙ্গে সে নিজেকেও দান করিতে চায়। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সেও সংসারে নিজের অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চায়। ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষার করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে সংসারের নির্মম প্রত্যাখ্যানে। সংসার তাহার কর্মটুকুই শুধু গ্রহণ করে, তাহাকে গ্রহণ করে না। সংসারে মানুষের কর্মটুকুই শুধু বাঁচিয়া থাকে, মানুষ বাঁচিয়া থাকে না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না, কিন্তু মানুষ সেইসঙ্গে অহংকে যখন চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অংশটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনমতে জমাবার জিনিস নয়।"

জলরাশি নীল। কবির হৃদয়ের গভীর সংশয় যেন জলরাশিকে নীল করিয়া তুলিয়াছে। **তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ**—সমুদ্রের নীল জলরাশির উপর সোনার তরী ভাসিয়া চলিয়াছে। কবি কল্পনায় এই দৃশ্যটি অসামান্য কাব্যব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। **আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার বিলাস হেন**—কবি বারবার সুন্দরী নারীর কাছে তাঁহার গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু সুন্দরী কোন উত্তর দেন নাই। তাঁহার এই বিচিত্র আচরণ কবির নিকট বিলাস বা প্রমোদ মনে হইয়াছে। **যখন প্রথম……নবীনে প্রাতে**—কবির কৈশোরকালে এই সুন্দরী নারী তাঁহার জীবনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কবিজীবনের প্রারম্ভেই ইনি কবির ধ্যানকল্পনায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। **চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে**—সমুদ্রের জলে অস্তগামী সূর্যের আলো পড়িয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ইহা যেন কবিহৃদয়ের চঞ্চল আশার প্রতিফলন। কবির মনে আশা জাগিতেছে, সুন্দরী বোধহয় তাঁহাকে সবকিছু বলিবেন। **আছে কি হেথায় নবীন জীবন** কবি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সুন্দরী যেখানে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন, সেখানে কি তিনি নূতন জীবনের স্বাদ পাইবেন। নূতন ভাবনায় কাব্যজীবন শুরু হইবে। **আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে**—কবি প্রশ্ন করিয়াছেন তিনি মনের মধ্যে পূর্ণ সৌন্দর্যোপভোগের যে আশা লইয়া যাইতেছেন, তাহা কি সফল হইবে? তিনি কি অখণ্ড সৌন্দর্যকে ভোগ করিতে পারিবেন। **কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো শান্ত ছবি**—সমুদ্রের জলরাশি যেন কবিহৃদয়ের প্রতিফলন। কখনো তাহা শান্ত আবার কখনো কি এক অশান্ত আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল। **বেলা বয়ে যায় পালে লাগে বায়**—কবি কৈশোর হইতে যৌবনে আসিয়াছেন। অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এখন কি ঘটিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। **পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে**—পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তাচলের পথে চলিয়া পড়িয়াছে। কবির জীবন° যেন সমাপ্তি সীমানায় চলিয়া আসিয়াছে। **সোনার তরণী কোথা চলে যায়**—সুন্দরী নারী কবিকে লইয়া সোনার তরীতে ভাসিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সোনার তরী কোন এক নিরুদ্দেশের পথ ধরিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে কিছুই জানা নাই। **আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে**—কবি তাঁহার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সুন্দরী তাঁহাকে লইয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছেন। কবির তাই জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, যেখানে যাত্রা শেষ হইবে সেখানে কি শান্তি আছে, অথবা আছে গভীর অন্ধকারের মধ্যে চিরসুপ্তির নীরবতা। **আঁধার রজনী …পাখা**—সমুদ্রের বুকে রাত্রি নামিবে যেন অন্ধকারের পাখায় ভর দিয়া, অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে। **সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক পড়িবে ঢাকা**—সন্ধ্যার আকাশে সূর্যের সোনালী আলোকধারা ঢাকা পড়িয়া যাইবে। অনিশ্চিত ব্যর্থতার মধ্যে কবির স্বর্ণোজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। **শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ**—কবি অন্ধকারে সুন্দরীকে দেখিতে পাইতেছেন না। শুধু তাঁহার দেহের সুরভি তাঁহার চেতনায় ধরা পড়িয়াছে। **গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি**—সুন্দরীর অপূর্ব কৃষ্ণকেশরাশি

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র মধ্যে কবি যে সৌন্দর্যময়ী অপরিচিতা নারীর কথা বলিয়াছেন, সেই নারী কবির বিশ্বসৌন্দর্যবোধের প্রতীক। ইহা তাঁহার প্রবল সৌন্দর্যানুভূতির উগ্র প্রকাশ। 'এই অত্যুগ্র সৌন্দর্য অনুভূতি কবি জীবনকে এমনভাবে গ্রাস করিয়াছে যে কবি তাঁহার নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা বুঝিতে পারিতেছেন না। ' এই অনুভূতি যেন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া তাঁহার ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া তাঁহাকে খেলার পুতুলের মতো চালিত করিতেছে। তাঁহার জীবন, তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাবচিন্তা কর্ম কিছুই যেন তাঁহার নয়, সমস্তই তাঁহার সমগ্র জীবনের অধীশ্বরী এই অনুভূতির আত্মপ্রকাশ। এই সৌন্দর্যানুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কবিসৃষ্টি বা কবি প্রেরণার মূল উৎস।'

কবি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীর মাধ্যমে তাঁহার অভিপ্সীত সৌন্দর্য উপভোগ ও প্রকাশ আকাঙ্ক্ষাকেই মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই রহস্যময়ী নারী এক প্রবল আকর্ষণে কবিকে অজানা ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবিকে নবনব রূপ উপভোগ করাইতে করাইতে নবনব রস পান করাইতে করাইতে, জীবনের অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিয়াছে—এ যাত্রার পরিসমাপ্তি কোথায়—এ অভিযানের সাফল্য কোথায় কবি তাহা জানেন না—তবুও সম্মোহিত অবস্থায় মৌনমহাসিনী অপরিচিতার আহ্বানে তাঁহার নিকট ধরা দিয়াছেন।'

আলোচ্য কবিতায় কবিকল্পনায় এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী এক অপূর্ব রস ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছেন। 'উপাসনার জীবনে কোন বস্তুগত লাভের বাসনা বা কোন আশা আকাঙ্ক্ষার সাফল্য কামনা নিরর্থক—কবির এ প্রশ্নের উত্তর কেবল সৌন্দর্য-দেবীর মৌন হাসি; সৌন্দর্যের আহ্বান নিরন্তর জীবনে আসিতেছে—সে আহ্বান জীবনে বরণ করিয়া লইতে হইবে, তাঁহার নিকট সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—জীবনে মেঘ ও রৌদ্র, মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া লাভালাভ ত্যাগ করিয়া সেই বস্তু নিরপেক্ষ সৌন্দর্য-দেবতাকেই একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে—'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় ইহাই যেন কবির একটা ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। এই সে স্বর্গময়ী কবির 'সোনার তরী'র কবিতার রহস্যময়ী মাঝি বা কাণ্ডারী, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রহস্যময়ী অপরিচিতা সুন্দরী নারী—পরবর্তীকালে ইনিই কবির 'জীবন-দেবতা' বা 'নীল সঙ্গিনী'তে রূপান্তরিত হইয়াছেন যাহার সম্পর্কে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন "জীবনদেবতা সেটা ফিজিক্যাল দেবতা।" "যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে সমস্ত ঘটনার ঐক্যদান, তাৎপর্য দান করিতেছে, আমার রূপান্তর—জন্ম জন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে—যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছিলাম।"

প্রশ্ন ৪। 'সোনার তরী' কবিতার সহিত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিকে 'সোনার তরী'র পরিপূরক কবিতা বলা যায় কিনা আলোচনা কর।

উত্তর। 'সোনার তরী' কবিতার সহিত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার ভাবগত

দ্বারের কাছে কবির চারি বছরের কন্যা বসিয়া ছিল। অন্যদিন এতক্ষণ তাহার স্নান সারা হইয়া যাইত। আজ মুখে তুলিতে না তুলিতে তাহার চোখে ঘুম নামিয়া আসিত।

আজ আর তাহার মাতা তাহাকে দেখে নাই। এত বেলা হইয়া গিয়াছে। তাহার স্নানাহার হয় নাই। এতক্ষণ সে কবির কাছে থাকিয়া বিদায়ের আয়োজন দেখিতেছিল। এখন শ্রান্তদেহে দ্বারের বাহিরে বসিয়া ছিল। কবি যখন কন্যার কাছে বিদায় চাহিলেন, তখন সে বলিল যে সে তাহাকে যাইতে দিবে না। সে কবির হাতও ধরিল না, দ্বারও রুদ্ধ করিল না। শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার প্রচার করিল। কবিকে সে যাইতে দিবে না। কিন্তু তবু হায়, এক সময় বিদায় দিতেই হয়।

কবি গন্তব্যস্থানে যাইতে যাইতে কন্যার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যে কন্যা কোথা হইতে কি শক্তি পাইয়া এমন কথা বলিতে পারিল। সে কাহাকে তাহার ছোটো ছোটো দুই হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিবে? বুক ভরা স্নেহ সম্বল করিয়া দ্বার প্রান্তে বসিয়া সে কাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে? এখানে ব্যথিত হৃদয় হইতে বহু লজ্জা ভয়ে মর্মের প্রার্থনাই শুধু ব্যক্ত করা চলে। কিন্তু এ প্রার্থনায় কেহ কান দেয় না। শিশু পিতাকে যাইতে দিতে চাহে নাই, অথচ সংসার তাহাকে লইয়া গেল। সে পরাজিত হইয়া দুই চোখে জল লইয়া দ্বারের কাছে বসিয়া রহিল।

কবি পথ চলিতে চলিতে দুইধারে দেখিতে পাইলেন শরতের শস্যক্ষেত্র শস্য-ভারে নত হইয়া রৌদ্র পোহাইতেছে। রাজপথ পাশে বৃক্ষরাজি উদাসীনভাবে দাঁড়াইয়া আপন ছায়ার পানে তাকাইয়া আছে। শরতের ভরা গঙ্গা খরবেগে বহিতেছে। সদ্যজাত গোবৎস যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া সুখে নিদ্রা যায়, নীল আকাশের বুকে শুভ্র মেঘমেষ তেমনি শুইয়া আছে। কবি রৌদ্রপ্লাবিত দিগন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর পানে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী যেন গভীর দুঃখে মগ্ন। কবি যতদূর যাইতেছেন, সর্বত্র যেন শোনা যাইতেছে সেই 'যেতে নাহি দিব' কথাটি। পৃথিবী ও নীল আকাশের বুক হইতে চিরকাল ধরিয়া ওই একই ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে 'যেতে নাহি দিব'।

তৃণ অতিশয় ক্ষুদ্র। কিন্তু পৃথিবী যেন তাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া বলে: 'যেতে নাহি দিব'। নির্বাপিত প্রায় দীপশিখাকে কে যেন অন্ধকারের গ্রাস হইতে টানিয়া রাখিয়া বলে 'যেতে নাহি দিব'। স্বর্গমর্ত্য ব্যাপিয়া সেই পুরাতন কথা: 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু হায় সকলকেই যাইতে দিতে হয়। কেহই কাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

আজ কবির কর্ণে অবিশ্রান্তভাবে বিশ্বের সেই মর্মভেদী ক্রন্দন কন্যার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইতেছে। শিশুর মতোই যেন বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরিয়া যে যাহা পাইতেছে, তাহাই হারাইতেছে। তথাপি তাহার মুষ্টি এখনও শিথিল হইল না। বিশ্ব এখনও কবির সেই চারি বছরের কন্যার মতো সমানে বলিয়া চলিয়াছে 'যেতে নাহি দিব'। প্রেমিকা তাহার প্রিয়জনকে ছাড়িতে চায় না: কিন্তু

লইয়া গেল। কন্যা পরাজিত হইয়া দ্বারপ্রান্তে বসিয়া রহিল। কবি চোখের জল মুছিয়া চলিয়া আসিলেন।

চলিতে চলিতে ·· পোহাইতেছে—কবি পথ চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন, চারিদিকে শস্যক্ষেত্রে শস্য পাকিয়া আছে। শস্যক্ষেত্র যেন অলসভাবে রোদ পোহাইতেছে।

শুভ্র খণ্ডমেঘ……শুয়ে—সদ্যোজাত সুন্দর গোবৎস যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া মাতার কোলের কাছে সুখে নিদ্রা যায়, শরতের শুভ্র মেঘের খণ্ড যেন নীল আকাশের কোলে সুখে ঘুমাইয়া আছে।

দীর্ঘ নৌদ্রে……নিশ্বাস—দিগন্ত বিস্তৃত পৃথিবী যেন যুগ যুগান্তের ক্লান্তি লইয়া পড়িয়া আছে। সেই দিকে চাহিয়া কবি দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

চলিতেছি যতদূর……নাহি দিব—কবি যতদূর গেলেন, তাহার কানে বা জগৎ লাগিল সেই 'যেতে নাহি দিব' ধ্বনি। পৃথিবীর বুক হইতে সেই ধ্বনি যেন আকাশের প্রান্ত সীমায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চিরকাল সেই ধ্বনি শোনা যাইতেছে 'যেতে নাহি দিব'।

তৃণ ক্ষুদ্র ··দিব—মাতা বসুমতী তাহার প্রতিটি সন্তানকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। তৃণ অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য। কিন্তু বসুমতী সেই তৃণকেও যেন বক্ষে বাঁধিয়া রাখিতে চায়।

আয়ুক্ষীণ দীপমুখে···নিব-নিব—দীপ শিখার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই তাহা নিভিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

চারিদিক হতে……কন্যা কণ্ঠস্বরে—চারিদিক হইতে কবি করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছেন। সেই ক্রন্দন যেন বিশ্বের মর্মভেদ করিয়া উঠিতেছে। কবির কন্যা বলিয়াছিল, 'যেতে নাহি দিব', সেই যাইতে না দিবার আকুতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শিশুর···মুষ্টি—পৃথিবীও যেন শিশুর মতো অবোধ। চিরকাল ধরিয়া যাহা কিছু সে পাইতেছে। তাহাই সে হারাইতেছে। এত হারাইবার পরও তাহার বুকের ধনকে টানিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

তবু অবিরত ……দিব—পৃথিবীতে প্রেমের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া রাখে। প্রেমের শক্তি তীব্র। প্রেমিকা প্রেমিককে প্রেমের বন্ধনে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে চায়। তাই সেও কবির চারি বছরের কন্যার মতো প্রেমের গর্বে বলে 'যেতে নাহি দিব'।

ম্লানমুখ……পরাভব—প্রেমিকা প্রেমিককে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। সংসার তাহার প্রেমিককে টানিয়া লইয়া যায়। প্রেমিকা ম্লানমুখে চোখে জল লইয়া পড়িয়া থাকে। পদে পদে তাহার গর্ব টুটিয়া যায়। তথাপি তাহার প্রেমের গর্ব পরাজিত হয় না।

তবু বিদ্রোহের……পারে—প্রেমিকা তাহার প্রেমিককে ধরিয়া রাখিতে পারে না। বাস্তব সংসারের আবর্তে তাহার প্রেমিক কোথায় হারাইয়া যায়। কিন্তু তথাপি সে পরাজয় স্বীকার করে না। কণ্ঠে বিদ্রোহের ভাব লইয়া আসিয়া

চঞ্চল স্রোতের……মায়া—চঞ্চল স্রোতে একটি ছায়া স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। মনে হয়, অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন মেঘের সে মায়া।'

তাই আজ……ব্যাকুলতা—কবি তরুর মর্মরধ্বনির মধ্যে বিচ্ছেদের করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছেন।

অলস উদাস্যভরে……লয়ে—দুপুরবেলায় তপ্ত বায়ু যেন শুষ্ক পত্র লইয়া নিবিড় মমতায় খেলা করে। শুষ্ক পত্রকে বায়ু যেন ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারে না। শুষ্ক পত্র কোথায় উড়িয়া যায়।

মেঠো সুরে……বাজে—বিশ্বের প্রান্তরের মাঝখানে অনন্তের উদাসী বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে মেঠো সুরে।

শুনিয়া উদাসী……টানি দিয়া—অনন্তের বাঁশী শুনিয়া মাতা বসুন্ধরার মন যেন উদাস হইয়া গিয়াছে। তিনি চুল খুলিয়া বসিয়া আছেন বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের মাঝে গঙ্গার ধারে। দেহের উপর দিয়া রৌদ্রে তিনি যেন টানিয়া দিয়াছেন রৌদ্রপীত স্বর্ণ অঞ্চল। **দূর নীলাম্বরে**—দূর নীল আকাশে। **দেখিলাম…মতো**—মাতা বসুমতী সর্বদা বিষন্ন মুখে বসিয়া থাকেন। মহাকাল তাঁহার বুক হইতে সব কিছু ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি অসহায়ভাবে ম্লান মুখে তাকাইয়া আছেন। প্রিয়জনকে ধরিয়া রাখিবার কোন উপায় তাহার নাই। কবির চোখে বসুমতীর ম্লানমুখ তাহার চারি বছর বয়সের কন্যার মুখের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

(১) **কহিলাম ধীরে,**
'তবে আসি'। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবি পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণের পর তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, এখানে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পূজার ছুটিতে কবি গৃহে আসিয়া পত্নী ও কন্যার সহিত কিছুদিন কাটাইয়া গেলেন। পূজার ছুটি ফুরাইয়া গেলে তিনি আবার দূর বিদেশে তাঁহার কর্মস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরে সকলে যখন নিদ্রায় মগ্ন, কবির গৃহে তখন ভৃত্যগণ জিনিসপত্র বাঁধায় ব্যস্ত। কাহারো চোখে ঘুম নাই। পাছে বিদেশে কোন জিনিস না পাওয়া যায়, তাই কবি পত্নী বোতল ও বাক্সে নানা জিনিস বোঝাই করিয়া দিতেছেন। সোনামুগ, সরুচাল, পান সুপারি, গুড়ের পাটালি, ঝুনা নারিকেল প্রভৃতি অজস্র জিনিসপত্র কবির সঙ্গে দিয়া বারবার সেগুলি ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন, ইতিমধ্যে যাইবার সময় হইয়া আসিল। কবি-পত্নীর নিকট বিদায় লইলেন। স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ বেদনায় কবি-পত্নীর অন্তর পূর্ণ হইয়া

বসুন্ধরার সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, বসুন্ধরার মাটির মাঝে তৃণাঙ্কুর কেমন শিহরিয়া উঠিতেছে। সুন্দর বৃন্তের মুখে কুসুমমুকুল আনন্দভরে ফুটিয়া থাকে। তরুলতা তৃণগুল্ম আশ্চর্য পুলকে প্রমোদরসে ভরিয়া উঠে। আজ যখন পক্ষীর শস্যক্ষেত্রের উপর শরতের কিরণ ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহার মনে জাগে মহাব্যাকুলতা। সমস্ত পৃথিবী তখন যেন তাহাকে আকুল ভাবে আহ্বান করে। সেই পৃথিবী হইতে চিরদিনের খেলার সঙ্গীদের আনন্দ কলরব তিনি শুনতে পাইতেছেন।

কবি মন হইতে সেই বিরহ দূর করিতে চাহিয়াছেন যে বিরহ হইতে মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে বিশাল প্রান্তর, গাভীগুলির ঘরে ফেরার দৃশ্য। এখন কবির নিজেকে মনে হয় নির্বাসিত। তাহার মনে হয়, আকাশ, পৃথিবী, শান্ত জ্যোৎস্নারাশিকে তিনি অন্তরে ভুলিয়া গেছেন। কিন্তু কিছুই তিনি পারেন না, শুধু শূন্যে তাকাইয়া থাকেন। সেখান হইতে অহরহ প্রাণ অঙ্কুরিত হইতেছে। শতলক্ষ সুরে গুঞ্জরিত হইতেছে, অসংখ্য ভঙ্গীতে নৃত্য উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কবি সেই সকল স্থানে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন।

বসুন্ধরা হইতে কতরূপে আনন্দরস বর্ষিত হইতেছে, কবি একমুহূর্তে সেই আনন্দরস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন। কবির মনের সেই আনন্দ লইয়াই তো অরণ্য শ্যামল হয়। কবির মুগ্ধতার ভাবে আকাশ পৃথিবীতল হৃদয়ের রঙে অঙ্কিত হইবে। এই সব দেখিয়া কবির মনে জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের নয়নে জাগিবে প্রেমের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে আসিবে গান। বসুন্ধরার সর্বাঙ্গ সহস্রের সুখে রঞ্জিত হইয়া আছে।

বসুন্ধরার মাটির সঙ্গে মিশিয়া আছে জীবজগতের অন্তরের প্রেম, জীবজগতের ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন দিকে দিকে বিছাইয়া রাখিয়াছে। কবি ইহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের প্রেম সযত্নে মিশাইয়া বসুন্ধরার অঞ্চলখানি রাঙাইয়া দিবেন। কবি তাঁহার হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্য দিয়া বসুন্ধরাকে সাজাইয়া দিবেন।

নদীর উপর কবির সেই গান নদীকূলে কাহাকেও কি মুগ্ধ করিবে না? শতবর্ষ পরে সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে তাঁহার প্রাণ কি কাঁপিয়া উঠিবে না? ঘরে ঘরে কত নরনারী সংসার করিবে, কবি কি তাহাদের প্রীতির মধ্যে বাস করিবেন না? তিনি কি তাহাদের মধ্যে হাসি, যৌবন, সুখ, প্রেমের রূপে বিকশিত হইবেন না।

বসুন্ধরা কি কবিকে ত্যাগ করিবে? তাঁহার সহিত যুগযুগান্তের মৃত্তিকা বন্ধন কি ক্ষয় হইয়া যাইবে? বসুন্ধরার লক্ষ বর্ষের স্নিগ্ধ ক্রোড় ত্যাগ করিয়া তিনি কি চলিয়া যাইবেন? এই সব তরুলতা, গিরি নদী বন, সুনীল গগন, উদার বাতাস, আলো সমাজ ছাড়িয়া তাঁহাকে কি চলিয়া যাইতে হইবে?

কবি বসুন্ধরাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। তিনি পশুপাখি কীট পতঙ্গ তরুলতা শুদ্ধরূপে বসুন্ধরার বুকে বাস করিতে চান। যুগে যুগে তিনি বসুন্ধরার অমৃতরসপূর্ণ স্তন পান করিয়া জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা মিটাইতে চান। তারপর যুবক সন্তানরূপে সুদূর্গম পথে বাহির হইতে চান।

বসুন্ধরার যুব এখনো কবির চোখে সুন্দর স্বপ্ন সৃষ্টি করে। বসুন্ধরার সবকিছু

এখনও রহস্যপূর্ণ মনে হয়। কবি এখনও তাঁহার বুকে শিশুর মতো বাস করেন। তিনি এখন জননী বসুন্ধরার মুখের পানে তাকাইয়া থাকেন। জননী যেন তাঁহার বাহুযুগল ধরিয়া তুলিয়া লন, তাঁহার বুকের মাঝে তাঁহার স্থান করিয়া দেন, বসুন্ধরার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের উৎসস্থানে তিনি যাইতে চান।

শব্দার্থ টীকাটিপ্পনী

১ম স্তবক

অয়ি বসুন্ধরে—হে পৃথিবী। **আমারে ফিরায়ে…… অঞ্চল তলে**—কবি বসুন্ধরার সন্তান। তাই বসুন্ধরা যেন তাহাকে কোলের ভিতর অঞ্চলের তলে টানিয়া লন।

ওগো মা মৃন্ময়ী…মতো—বসুন্ধরার মাটির মধ্যে কবি নিজেকে চারিদিকে বসন্তকালের আনন্দের মতো ছড়াইয়া দিতে চান।

বিদারিয়া—বিদীর্ণ করিয়া। **বক্ষ পঞ্জর**—বুকের পাঁজর।

বিদারিয়া……অন্ধকারাগার—কবি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়া সুখ পান না। তিনি সংকীর্ণ গণ্ডীর বন্ধন কাটাইয়া অনন্ত আনন্দের মধ্যে নিজেকে মুক্তি দিতে চান।

হিল্লোলিয়া—হিল্লোল তুলিয়া। **মর্মরিয়া**—মর্মরধ্বনি তুলিয়া। **কম্পিয়া**—কাঁপিয়া। **বিকিরিয়া**—বিকিরণ হইয়া। **সচকিয়া**—সচকিত হইয়া। **সরসিয়া**—সরস হইয়া।

যাই পরশিয়া…… আন্দোলনে—শস্যক্ষেত্রে শস্যগুলি পাকিয়া সোনার রং ধরিয়াছে। শস্যভারে শস্যগাছগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। কবি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সেইগুলি স্পর্শ করিতে চান।

নবপুষ্পদল…… মধুবিন্দুভারে—নব পুষ্পদলকে মধুর গন্ধে ও মধুতে পূর্ণ করিয়া দিতে কবির সাধ হয়।

নীলিমায়…… অনন্ত কল্লোলগীতে—কবির ইচ্ছা করে, মহাসমুদ্রের জলরাশিকে নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার তীরে তীরে কল্লোলধ্বনির তালে তালে নৃত্য করেন।

শুভ্র উত্তরীয়……নিভৃতে—শুভ্র উপবীতের মতো পর্বতচূড়ায় কলঙ্কহীন নীহারের নির্জনতায় কবি আপনাকে বিছাইয়া রাখিতে চান।

২য় স্তবক

যে ইচ্ছা গোপনে……অন্তর ভেদিয়া—কবির মনে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ইচ্ছা সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি এখন প্রবলবেগে বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছে। কবি সেই বাসনাগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কিভাবে দিক দিগন্তে পাঠাইবেন, তাহা ভাবিয়া পান না।

আমি তাহাদের……জানে—কবি ভ্রমণকারীদের লেখা নানা ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের সহিত তিনিও মানস ভ্রমণ করেন। কল্পনার চোখে বসুন্ধরার নানা বৈচিত্র্য দেখেন।

ঘুমাইয়া দেন। প্রতি গুহা, গৃহে প্রবেশ করিয়া বিশাল একটি আঁচলের মতো বিশ্বকে ঢাকিয়া দেন।

৬ষ্ঠ স্তবক

আমার পৃথিবী……সবিতৃমণ্ডল—কবি বসুন্ধরার সহিত আপন প্রাণের নিবিড় সংযোগ অনুভব করিয়াছেন। তিনি জানেন, বসুন্ধরা তাঁহাকে লইয়া অনন্তকাল ধরিয়া অশ্রান্তচরণে সৌরমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছে।

তাই আজি……তৃণাংকুর—কবি পদ্মাতীরে বসিয়া আনমনে সমুখপানে তাকাইয়া থাকেন। তাঁহার মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টির সমুখে বসুন্ধরার বিচিত্র দৃশ্যাবলী ফুটিয়া ওঠে। তিনি দেখেন, বসুন্ধরার মাটির মধ্য হইতে তৃণরাজি কেমন সুন্দরভাবে অঙ্কুরিত হইতেছে।

কুসুম মুকুল……ওঠে হরষিয়া—কবি বসুন্ধরার পানে তাকাইয়া দেখেন, সুন্দর সুখের মুখে কি আনন্দের মধ্যে কুসুম মুকুল ফুটিয়া থাকে, প্রভাত কিরণে তৃণলতাগুল্ম অদ্ভুত আনন্দের আবেগে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে।

তাই আজি কোনদিন……মহাব্যাকুলতা—শস্যক্ষেত্রে যখন ফসল পাকিয়া থাকে, তাহার উপর পড়ে শরতের সোনালি আলো, আলোকের মধ্যে নারিকেল গাছগুলি ঝিকমিক করিতে থাকে, তখন কবির অন্তরে জাগে মহাব্যাকুলতা। তিনি বসুন্ধরা নিবিড় সান্নিধ্যলাভের জন্য অস্থির হইয়া ওঠেন।

সে বিচিত্র……পরিচিত রব—কবি তাঁহার চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে সাদর আহ্বান শুনিতে পান। এই পৃথিবীতে তাঁহার চিরদিনকার সঙ্গীরা সর্বদা আনন্দকলরবে মত্ত। কবি যেন তাহাদের আনন্দ খেলার পরিচিত ধ্বনি শুনিতে পান।

দূর করো সে বিরহ……সন্ধ্যাকালে—কবি বসুন্ধরার বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সহিত বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সন্ধ্যার আলো অন্ধকারে তাঁহার চোখের সমুখে ভাসিয়া ওঠে বিশাল প্রান্তর। দূর গোষ্ঠে—মাঠ পথে গাভীগুলি যখন ধূলি উড়াইয়া ফেরে, তরুঘেরা গ্রাম হইতে সন্ধ্যাকালে ধোঁয়ার রেখা ভাসিয়া যায়।

মনে হয়……অন্তরে—বসুন্ধরার অসংখ্য রূপবৈচিত্র্য আপন মহিমায় উজ্জ্বল। কবি তাহাদের সান্নিধ্য লাভ করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার মনে হয়, তিনি একাকী নির্বাসিত হইয়া পড়িয়া আছেন। বসুন্ধরার সমস্ত বহির্বৈচিত্র্যকে তিনি অন্তরের মধ্যে টানিয়া লইতে চান। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিঃশেষে নিজেকে মিলাইয়া দিতে তাঁহার সাধ হয়।

আমারে ফিরায়ে……তৃষিত পরাণি যত—কবি বসুন্ধরার বিচিত্ররূপের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। যে স্থান হইতে শতসহস্ররূপে নবনব প্রাণ অঙ্কুরিত হইতেছে, শতলক্ষসুরে গান গুঞ্জরিত হইতেছে, অসংখ্য ভঙ্গীতে নৃত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, চিত্ত অপূর্ব ভাবস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, বসুন্ধরা সেখানে কল্পবৃক্ষের মতো দণ্ডায়মান, তাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে অগণ্য তরুলতা পশুপাখি, কবি সেই সব স্থানে আপন হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া দিতে চান।

বসুন্ধরার বুকেই জন্মগ্রহণ করিতে চান। বসুন্ধরার বুকে শৈশব কাটিয়া গেলে তিনি যুবক হইয়া দেশ দেশান্তরে দুর্গম পথে অভিযান করিতে চান। তাঁহার বাহুতে থাকিবে বল, বক্ষে থাকিবে সাহস। দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্ক সমাজে দুর্গম পথে তিনি বিজয় অভিযান করিতে চান। বসুন্ধরার বুকে যত অপরূপ বৈচিত্র্য সম্ভার আছে, তিনি তাহার পূর্ণ স্বাদ পাইতে চান। বসুন্ধরার বুকেই তিনি জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে অভিলাষী।

(১২) এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলই রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশু প্রায়,
মুখ পানে চেয়ে। (ধ্রুবক-৬)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বসুন্ধরার প্রতি কবির গভীর আসক্তির বিষয় প্রচারিত হইয়াছে।

কবি সারাজীবন ধরিয়া বসুন্ধরার অপরূপ রূপবৈচিত্র্য উপভোগ করিয়াছেন। বসুন্ধরার বিশাল বৈচিত্র্য তাঁহার প্রাণে আনন্দের হিল্লোল জাগাইয়া তুলিয়াছে। বসুন্ধরার প্রতিটি রূপের সহিত তিনি একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। নানাভাবে তিনি তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এখনো যেন তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। বসুন্ধরার সবকিছুই তাঁহার কাছে অনন্ত রহস্যপূর্ণ মনে হয়। বসুন্ধরার বৈচিত্র্যের দিকে তাকাইয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। শিশু যেমন চোখ ভরা বিস্ময় লইয়া মাতার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে কবিও তেমনি চোখভরা বিস্ময় ও মনভরা মুগ্ধতা লইয়া বসুন্ধরার পানে তাকাইয়া আছেন। বসুন্ধরার স্নেহরসে অভিষিক্ত হইবার জন্য তাঁহার যেমন আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'বসুন্ধরা' কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত কর।
উত্তর। 'সারসংক্ষেপ' দ্রষ্টব্য।
প্রশ্ন ২। 'বসুন্ধরা' কবিতার নামকরণের তাৎপর্য আলোচনা কর।
উত্তর। 'নামকরণ' দ্রষ্টব্য।
প্রশ্ন ৩। 'বসুন্ধরা' কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মর্ত্য প্রীতির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। 'বসুন্ধরা' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বসুন্ধরার অপরূপ রূপসম্ভার ও বিশাল বৈচিত্র্যের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। বসুন্ধরার সহিত তিনি জন্ম জন্মান্তরের নিবিড় সাযুজ্য অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইয়াছে, তিনি সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে মাটির সহিত মিশিয়া আছেন এবং বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ নিজের জীবনধারার মধ্যে অনুভব করিয়াছেন। তরুলতা, আকাশ, মাঠ, বালুচর, নদী, সন্ধ্যাতারাকে তাঁহার পরমাত্মীয় বলিয়া মনে

ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা ছন্দকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, (১) তান প্রধান ছন্দ (২) ধ্বনি প্রধান ছন্দ (৩) শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। ইহা ছাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ নামে আর এক প্রকার ছন্দও আছে।

তান প্রধান ছন্দ

তান প্রধান ছন্দ পয়ার জাতীয় ছন্দ। এই ছন্দ 'অক্ষরমাত্রিক' বা 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ নামেও পরিচিত।

তান প্রধান ছন্দ বীণালয়ের ছন্দ। কবিতা পাঠ করিবার সময় শুধু অক্ষরধ্বনি ছাড়াও একটি টানা সুরের প্রবাহ থাকে। 'এই টানটাই পয়ারের বিশেষত্ব।' অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা তান মিশিয়া থাকে। কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও ওঠে, এবং স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়।

সুতরাং বলা যায়, যে ছন্দের মধ্যে তান বা একটানা সুরধ্বনি প্রবাহিত হইয়া চলে, তাহাকে তান প্রধান ছন্দ বলে।

যেমন—

(১) মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ (কাশীরাম দাস)

(২) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা. সবে (অবোধ আমি।) অবহেলা করি,
পর ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ! (মধুসূদন দত্ত)

(৩) এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শা জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন-ধন-মান।
(রবীন্দ্রনাথ)

তান প্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য

তান প্রধান ছন্দে সাধারণ নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য গুলি পরিলক্ষিত হয়।

(১) এই ছন্দে সাধারণত প্রতি Syllable বা অক্ষরকে একমাত্রা ধরা হয়। কোন শব্দের শেষে হলন্ত Syllable বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই মাত্রায় ধরা হয়।

(২) এই ছন্দে 'সাধু ভাষার' শব্দের প্রাধান্য দেখা গেলেও ইহার পাশাপাশি তৎসম ও অর্ধতৎসমও ব্যবহার করা হয়।

(৩) এই ছন্দে স্বরের হ্রস্ব বা দীর্ঘ বিচারের অবকাশ প্রায়শ থাকে না।

(৪) এই ছন্দে একদিকে যেমন যুক্তাক্ষর বর্জিত পঙক্তি রচনা করা যায়, তেমনি যুক্তাক্ষর বহুল পঙক্তি রচনারও কোন বাধা নাই।

(৫) এই ছন্দে তানপ্রবাহের জন্য লঘু গুরু অক্ষরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও লক্ষিতে পাওয়া যায়।

(৬) তান প্রধান ছন্দ পয়ার জাতীয় বলিয়া পয়ারের পোষণ শক্তি ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

(৭) তান প্রধান ছন্দ ধীরলয়ের ছন্দ বলিয়া ইহার মধ্যে গতি মন্থরতা পরিলক্ষিত হয়।

ধ্বনি প্রধান ছন্দ

যে ছন্দে উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তাহাকে ধ্বনি প্রধান ছন্দ বলে।

ধ্বনি প্রধান ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ নামেও পরিচিত।

ধ্বনি প্রধান ছন্দ বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। তান প্রধান ছন্দে যে সুরের টান থাকে, ধ্বনি প্রধান ছন্দে তাহা দেখা যায় না।

যেমন—

ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর
যা কিছু হারায়, গিন্নী বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।

এই ছন্দে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব, এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষর ব্যবহার করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। যেমন—

চারমাত্রার পর্ব—

সে দিন ও দেহ / মধুনিশি   প্রাণে গিয়ে / ছিল মিশি
মকুলিত / দশদিশি / কুসুম দ / লে,
দুটি সোহা / গের বাণী   হতো যদি / কানাকানি
যদি ওই / মালাখানি / পরাতে গ / লে।

পাঁচমাত্রার পর্ব—

নাহি গো যদি / সে রূপ জ্যোতি / কি আছে তাহে / ক্ষতি মা ?
ও-হিয়া-মাঝে / স্নেহ তো রাজে / তেমনি।
বিগত তব / যত বিভব / অতীত তব / গরিমা
তবু তো তুমি / জনমভূমি / জননী।

ধ্বনি প্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য

ধ্বনি প্রধান ছন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়—

(১) এই ছন্দ বিলম্বিত লয়ের ছন্দ।

(২) এই ছন্দে যৌগিক অক্ষর দুইমাত্রার (দীর্ঘ), অন্য অক্ষর একমাত্রার (হ্রস্ব)। সময় বিশেষে যৌগিক স্বর দুই মাত্রার হইতে পারে।

(৩) এই ছন্দের মধ্যে গীতিধর্ম প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।

(৪) এই ছন্দে যুক্ত ব্যঞ্জনের আগের স্বরটি দুইটি মাত্রার।

(৫) এই ছন্দে হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বর দীর্ঘ।

(৬) এই ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়।

দাঁড়ায়ে জননী—এই পর্বে ৬টি স্বরান্ত অক্ষর আছে। ইহাদের মাত্রা সংখ্যা—৬।

শরৎকালের—এই পর্বটিতে রৎ ও লের—এই দুইটি হলন্ত অক্ষর। মোট মাত্রা—৬।

স্বরান্ত অক্ষর—বিবৃত (open) ও হলন্ত অক্ষর 'সংবৃত' (closed)। অক্ষরের মধ্যে আবার নানাধরণের শ্রেণীবিভাগ আছে। যথা—লঘু অক্ষর, গুরু অক্ষর, মৌলিক অক্ষর, যৌগিক অক্ষর, স্বভাব মাত্রিক অক্ষর, প্রভাব মাত্রিক অক্ষর।

লঘু অক্ষর—যে অক্ষর উচ্চারণকালে বাগযন্ত্রের স্বল্প আয়াস প্রয়োজন হয়, তাহকে লঘু অক্ষর বলা হয়। যেমন—খেলা, মেলা ইত্যাদি।

গুরু অক্ষর—যে অক্ষর উচ্চারণ কালে বাগ্‌যন্ত্রের অধিক আয়াসের প্রয়োজন হয়, তাহাকে গুরু অক্ষর বলে। যেমন—উত্তর, মন্দির প্রভৃতি।

মৌলিক অক্ষর—যে অক্ষরগুলিতে একটিমাত্র ধ্বনি থাকে, তাহাকে মৌলিক অক্ষর বলা হয়। যেমন—আলো, ভালো, হরি ইত্যাদি।

যৌগিক অক্ষর—যে অক্ষরগুলিতে একাধিক ধ্বনি থাকে, তাহাকে যৌগিক অক্ষর বলা হয়। যেমন—ঐ = অ + ই। ঔ = অ + উ।

স্বভাবমাত্রিক অক্ষর—যে অক্ষর অতি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করা যায়, তাহাকে স্বভাবমাত্রিক অক্ষর বলে। যেমন—সাজ, কাজ ইত্যাদি।

প্রভাব মাত্রিক অক্ষর—যে সকল অক্ষর বিশেষ রীতিতে জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাকে প্রভাবমাত্রিক অক্ষর বলে। যেমন—ভেরী, বাধা ইত্যাদি।

মাত্রা—

বাংলা ছন্দ বিশেষভাবে 'মাত্রাগত।'

মাত্রা প্রকৃতপক্ষে সময় বা কাল পরিমাণ। এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময় অনুযায়ী অক্ষরের মাত্রা নির্ধারণ করা যায়। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'মাত্রা' সম্পর্কে বলিয়াছেন "বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। মাত্রার মূল তাৎপর্য duration বা কাল পরিমাণ। এক একটি অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে, তদনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়।… সাধারণতঃ হ্রস্ব বা একমাত্রার এবং দীর্ঘ বা দুই মাত্রার—এই দুই শ্রেণীর অক্ষর গণনা করা হয়।…

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তদ্বিষয়ে নির্দিষ্ট বিধি আছে, কিন্তু বাংলায় তত বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, ছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়।"

'মাত্রা' সম্বন্ধে কয়েকটি মূলনীতি স্মরণ রাখা কর্তব্য।

(১) কোন পর্বাংশে একাধিক প্রভাব মাত্রিক অক্ষর থাকিবে না।

(২) একই পর্বাংশে স্বভাবমাত্রিক অক্ষরের সঙ্গে বিপরীত গতির অক্ষর বসিতে পারিবে না।

স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর
রীতি—তান প্রধান
লয়—বিলম্বিত

(৬) দেখ দ্বিজ মনসিজ / জিনিয়া মূরতি। (৮+৬)
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র / পরশয়ে শ্রুতি॥ (৮+৬)

পর্ব—অষ্ট মাত্রিক
চরণ—দ্বি পর্বিক—অপূর্ণপদী
স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর
রীতি—তান প্রধান
লয়—ধীর

(৭) নমি তোমা নরদেব / কি গর্ব গৌরবে। (৮+৬+৬)
দাঁড়ায়েছো তুমি
সর্বাঙ্গে প্রভাত রশ্মি / শিরে চূর্ণ মেঘ (৮+৬+৬)
পদে শষ্পভূমি।

পর্ব—অষ্ট মাত্রিক মিশ্র
চরণ—ত্রি পর্বিক
স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর
রীতি—তান প্রধান
লয়—ধীর

(৮) ছিল আশা মেঘবাদ / মুদিব অন্তিমে
এ নয়ন দ্বয় আমি / তোমার সম্মুখে ;
সঁপি রাজ্য ভার পুত্র / তোমায় করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি / বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা / সে সুখ আমারে।

পর্ব—অষ্ট মাত্রিক
চরণ—দ্বি পর্বিক—অপূর্ণপদী

স্তবক—অমিত্রাক্ষর—সমপদী
রীতি—তান প্রধান
লয়—ধীরে।

(৯) দখিন হাওয়া / কলজে তারে / উড়িয়ে নে যাই / চল্
গোলাপী রং / পরীর দেশে / চালবি পরি / দল ;
[illegible]র থাকে / মণির মালায় / তারার বাতি / জেলে
গাঁথবে তোমায় / চিকণ হারে / নীলার পালায় / ঢেলে

পর্ব—চতুর্মাত্রিক
চরণ—চতুষ্পর্বিক—অপূর্ণপদী
স্তবক—সমপদী—মিত্রাক্ষর—
রীতি—ঘাতাঘাত প্রধান
লয়—দ্রুত

(১০) বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদের এলো / বান।
শিবঠাকুরের / বিয়ে হলো / তিন কন্যা / দান॥
এক কন্যা / রাঁধেন বাড়েন / এক কন্যা / খান।
এক কন্যা / গোঁসা করে / বাপের বাড়ী / যান॥

পর্ব—চতুর্মাত্রিক
চরণ—চতুষ্পর্বিক—অপূর্ণপদী
স্তবক—সমপদী মিত্রাক্ষর
রীতি—ঘাতাঘাত প্রধান
লয়—দ্রুত

(১১) দিনের আলো / নিভে এলো / সূর্যি ডোবে / ডোবে।
মেঘের পরে / মেঘ জমেছে / চাঁদের লোভে / লোভে।

পর্ব—চতুর্মাত্রিক
চরণ—চতুষ্পর্বিক—অপূর্ণপদী
স্তবক—সমপদী মিত্রাক্ষর
রীতি—ঘাতাঘাত প্রধান
লয়—[illegible]